শ্রীচৈতন্যের শিষ্যব্যবহার

বীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ★ ★ ১৯৮৭

প্রকাশক :

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
২৫৭বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ১৯৫৭

মুদ্রাকর :

শ্রীশান্তিময় ব্যানার্জী
প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিমিটেড
১, গদাধরবাবু লেন
কলিকাতা—৭০০ ০১২

ভূমিকা

(২য় সংস্করণ)

অধ্যাপক ডক্টর অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এম. এ. পি. এইচ. ডি.
বেদান্তশাস্ত্রী, কাব্য-বেদান্ত-বেদান্ততীর্থ।
সম্পাদক, 'বাসুদেব'।

"বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগং
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥"—শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম।

—যে এক পুরাণ পুরুষ বৈরাগ্য, তত্ত্ববিদ্যা এবং নিজসম্বন্ধীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শরীর ধারণ ক'রেছিলেন, যিনি পরম কৃপার সমুদ্র, সেই তাঁহার আমি শরণ গ্রহণ করি।

শ্রীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমপূত জীবনের 'আচার্য্যের' দিকটিই উক্ত শ্লোকে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে;—বলা হয়েছে যে, জনগণকে তিনি বিষয়-বৈরাগ্য, জ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি-শিক্ষা প্রদানের কার্য্যেই নিজের সমগ্র জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। নিজজীবনে স্বয়ং অন্তরঙ্গভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন করেছেন, আবার বহিরঙ্গভাবে আনুষ্ঠানিক কৃষ্ণভক্তির যাজনও ক'রেছেন, ও সেইসঙ্গে ভগবদ্-বহির্মুখী জনগণকে অধিকার ও যোগ্যতানুসারে বিষয়বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তির অনুশীলনের উপদেশ ও শিক্ষাও দিয়েছেন। বলা বাহুল্য —এ সমস্তই আচার্য্যেরই কাজ। আচার ও প্রচার—এই উভয়ই যিনি করেন তিনিই যথার্থ আচার্য্য। "আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থম্ আচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে ॥" আলোচ্য 'শ্রীচৈতন্যের শিষ্যব্যবহার' গ্রন্থেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই আচার্য্যজীবনই বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। অন্তরঙ্গ শিষ্য বা ভক্তদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর যে অপূর্ব্ব নিগূঢ় মাধুর্য্য ও রহস্যভরা লীলাবিলাস, তা যেমন আস্বাদ্য তেমনি শিক্ষাপ্রদ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার যথার্থই বলেছেন—"চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে। কি লাগি কি

করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥" আলোচ্য গ্রন্থে মরমী লেখক সেটি স্বয়ং আস্বাদন ক'রে, অপরকেও তা' পরিবেশন ক'রেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক অনেক গ্রন্থই পরবর্ত্তিকালে রচিত হয়েছে, যেমন—মুরারিগুপ্তের কড়চা, পরমানন্দসেনের সংস্কৃত ভাষায় রচিত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, চৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত, চূড়ামণিদাসের গৌরাঙ্গবিজয়, গোবিন্দ-দাসের কড়চা প্রভৃতি। এছাড়াও, উড়িয়া ভাষায় রচিত বৈষ্ণবচরণদাসের 'চৈতন্য চকৃড়া' গ্রন্থ, সম্বলপুর নিবাসী বৈষ্ণব কবি শ্রীবৈষ্ণবচরণের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থ, দিবাকরদাসের 'জগন্নাথচরিতামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও প্রসঙ্গতঃ তাঁর ভক্তগণের অনেক কথা বর্ণিত হয়েছে। আরও পরবর্ত্তিকালে ডঃ দীনেশ সেনের 'Chaitanya And His Age' গ্রন্থ, নীলকণ্ঠদাসের 'ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য' এবং সারদেশানন্দের 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যের ও তাঁর সময়কার অনেক ভক্তের জীবনের অনেক কথা এবং অনেক ঘটনাই বিবৃত আছে। কিন্তু আলোচ্য 'শ্রীচৈতন্যের শিষ্যব্যবহার' গ্রন্থে গ্রন্থকার প্রধানতঃ নির্ভর ক'রেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের সুবিখ্যাত 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের উপরেই। মুখ্যতঃ সেই গ্রন্থের আলোকেই লেখক আলোচ্য গ্রন্থখানিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে তাঁর শিষ্য বা ভক্তগণের সঙ্গে ব্যবহারের দিকটি সবিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

(২)

শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রাজা প্রতাপরুদ্র, ছোট হরিদাস প্রভৃতি মরমীভক্ত বা শিষ্যগণের সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ ব্যবহার, অনুশাসন, শিক্ষাদান, অন্তরঙ্গ কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদন প্রভৃতি ক'রে গেছেন, সে-সবের মধ্য দিয়ে তাঁর পূত চরিত্রের অনবদ্য মহিমা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনই তাঁর লোকচরিত্রের জ্ঞান, সামাজিক ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি যথোচিত সম্মানদান, গূঢ়-গম্ভীর, কঠোর-কোমল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, শাস্ত্রসমূহের রাহস্যিক তাৎপর্য ও তত্ত্বজ্ঞান, এবং সর্ব্বোপরি শাস্ত্র ও লোকমর্যাদারক্ষণ--এসকলেরও নিপুণ পরিচয় পাওয়া যায় সেই সকল ব্যবহারের মধ্যেই। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক এই সকল চিত্র অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহিরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীল সনাতন ও হরিদাসের সাথে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। "যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার"॥ (চৈঃ চঃ)।—মহাপ্রভুর নিজ মুখের এই উক্তিটির সার্থকতা তিনি স্বয়ং তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত ক'রে দেখিয়েছেন। পরমভক্ত সনাতন ও হরিদাসকে ধারণাতীত সম্মানদান, তাঁদের আন্তরিক দৈন্য ও নিরভিমানতার অকুণ্ঠ প্রশংসা, এমনকি তাঁদের স্তুতিকরা; আবার পরক্ষণেই ব্যবহারিক লোকমর্যাদা রক্ষার জন্য সেই তাঁদের প্রতিই গুরুভাবোচিত ব্যবহার ও নির্দেশ প্রভৃতির মধ্য দিয়েই পাওয়া যায় এর সবিশেষ পরিচয়। একদিকে যেমন তিনি ঐকান্তিকী কৃষ্ণভক্তির মর্য্যাদা দান করেছেন সনাতন, হরিদাস প্রভৃতি পরম ভক্তগণের ভক্তির মহিমা প্রকাশ ক'রে—তাঁদেরকে স্তবস্তুতি, আলিঙ্গন ও সম্মানদান ক'রে, তেমনই আবার অন্যদিকে তিনি লোকাচার ও সদাচার রক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সেই সব ভক্তগণকে শুদ্ধা ভক্তিমার্গ ও সদাচারনির্দ্দেশিত পথে ঠিক ঠিক পরিচালনা ক'রেছেন। শিষ্য বা ভক্তগণের মধ্যে যোগ্যতা ও অধিকারানুসারে কাহাকেও-বা তাঁহাকে বেদাদিশাস্ত্রবিহিত বিধিমার্গের উপদেশ করতে দেখা যায়, আবার কাহাকেও-বা অধিকারানুসারে রাগমার্গের উপদেশও করতে দেখা যায়—দিতে দেখা যায় আপনভাবে চলবার অবাধ অধিকার! বিষয়ত্যাগী বৈরাগীর জীবনকে তিনি কঠোর ত্যাগ-বৈরাগ্যের পথে যেভাবে সুপরিচালিত করেছেন, রঘুনাথদাসের জীবন তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অতি সামান্য তুচ্ছ কারণে ছোট হরিদাসকে শাসনের মধ্য দিয়েও এবিষয়ে মহাপ্রভুর সুদৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। মলিন মনেতে না হয় কৃষ্ণের স্মরণ॥"…"বৈরাগী হইয়া করে প্রকৃতি সম্ভাষণ। দেখিতে না পারি মুঁই তাহার বদন॥"—তাঁহার এই সকল উক্তি কেবল কথার মধ্যেই সীমিত থাকে নাই, কার্য্যক্ষেত্রেও অতিশয় কঠোরভাবেই তিনি তা রূপায়িত করেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমে দ্রবীভূত কুসুমকোমল চিত্তে এরূপ 'বজ্রাদপি' কঠোরভাব তাঁহার আচার্য্যোচিত কঠিন ব্রতপালনের পক্ষে উপযোগীই ছিল বটে!

আবার অন্যদিকেও দেখা যায়—অন্তরঙ্গ প্রেমে ও হৃদ্যতায় পরম আপনার জন বোধে, শ্রীল সনাতন ও দামোদর পণ্ডিত প্রমুখ ভক্তেরা কখন-কখনও মহাপ্রভুকে শাসনও করেছেন; আর প্রেম, উদারতা ও করুণার জীবন্তবিগ্রহ, নিরভিমান প্রভু তাঁদের সেই স্নেহের শাসন আদরের সাথে মেনেও নিয়েছেন! এমনই অপূর্ব্ব ছিল তাঁর শিষ্যব্যবহার।

পরিশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনদর্শন, ভাব ও কর্ম্মধারা সম্বন্ধে লেখকের একটি স্বতন্ত্র আলোচনাও গ্রন্থখানিতে স্থান পেয়েছে। এটি না থাকলে গ্রন্থটি সত্যই অসম্পূর্ণ থেকে যেত। বলাবাহুল্য, আলোচনাটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী ও তাৎপর্য্যপূর্ণ ই হয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তৎকালীন সমাজের রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মীয় ভাবধারা প্রভৃতির বিশ্লেষণ ক'রে, লেখক সেই যুগের জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা, ও ধর্ম্মজগতে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা ব'লেছেন। আবার অধিকারিভেদে ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যাপারে একদিকে গৃহী ভক্তদের জন্য শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের, ও অন্যদিকে গৃহত্যাগী ভক্তদের জন্য শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের নেতৃত্বে পৃথক্-পৃথক্ ব্যবস্থাগ্রহণের কথা এবং সেই সঙ্গে সাধারণভাবে মহাপ্রভুর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সুনেতৃত্ব, যুগোপযোগী ধর্ম্মাদর্শ ও শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি বিষয়ও তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত উপস্থাপিত ক'রেছেন, যা সত্যই প্রশংসার্হ।

আলোচ্য গ্রন্থখানির এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। আনন্দের বিষয়, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ায়, গ্রন্থখানি যে পাঠকসমাজের হৃদয়-মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে পেরেছে, সেটি বুঝা যায়। এই দ্বিতীয় সংস্করণে বিষয়বস্তুর বর্ণনার মধ্যে কিছুকিছু পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে; যার ফলে গ্রন্থখানির গৌরব ও মাধুর্য্য সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে ব'লেই মনে করি! এতদ্ভিন্নও প্রসঙ্গক্রমে তুলনামূলকভাবে গীতা-ভাগবতাদি ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী বা উক্তি-সকলের উল্লেখ গ্রন্থখানিকে অধিকতর সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে।

এককথায়, এই অপূর্ব্ব অনবদ্য গ্রন্থখানিকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একখানি ক্ষুদ্র 'জীবন-দর্পণ'ও বলা যেতে পারে। মননশীল গ্রন্থকার সুনিপুণ ও সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই জীবন ও ব্যবহার ভক্ত ও পাঠকগণের নিকট সম্যগ্‌ভাবে উপস্থাপিত ক'রেছেন। বর্তমান যুগের উচ্ছৃঙ্খল তথাকথিত-ধর্ম্মজীবনে (?) এইরূপ আদর্শের অনুসরণ ও রূপায়ণ একান্তই প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে। দুঃখের বিষয়, মহাপ্রভুর অনুত্তম অনবদ্য অনুসরণীয় জীবনাদর্শ ও শিক্ষা থেকে বর্ত্তমান বৈষ্ণবসমাজ অনেকাংশেই দূরে স'রে গিয়েছে। যথোচিত শ্রদ্ধার সাথে এই পুস্তকখানি পাঠ ও আলোচিত বিষয়বস্তুর অনুধ্যানের ফলে তাঁদের এবং অন্য সকলেরও জীবনগঠন ও ধর্ম্মজীবন পরিপালনে যে বিশেষ সহায়তা লাভ হবে, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নেই।

উপসংহারে, শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং এই গ্রন্থরত্নকেও প্রণাম জানিয়ে ও সেইসঙ্গে গ্রন্থখানির বহুলপ্রচার কামনা ক'রে, এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি বিনীত প্রণামে—

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় সভক্তায় গরীয়সে।
প্রেমভক্তিপ্রদাত্রে চ সপার্ষদায় তে নমঃ॥
ধর্ম্মাচার্য্যবরিষ্ঠায় শাস্ত্রসংরক্ষকায় চ।
রাধাকৃষ্ণ স্বরূপায় নমস্তে প্রভবিষ্ণবে॥

ইতি—
শ্রীঅমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

গ্রন্থকারের নিবেদন

দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রথম সংস্করণের বইগুলো নিঃশেষিত হ'য়ে যাওয়ায় এবারে ফার্মা কে. এল. এম. প্রাঃ লিঃ-এর মাধ্যমে দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশিত হ'ল। এর আগে বইখানি ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ মনীষিগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছিল। আশা করা যায়, গত কয়েক বছরের চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার ফলে বর্তমান সংস্করণটিতে নতুন ক'রে যে-সব তথ্য বা তত্ত্ব সংযোজিত হয়েছে, তাতে বইটি এখন সুধীসমাজে অধিকতর সমাদরলাভে সক্ষম হবে। এছাড়া, স্থানবিশেষে ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গিরও কিছু-কিছু পরিবর্তন ক'রে, এটাকে আরও বেশী সুখপাঠ্য ক'রে তোলারও চেষ্টা করা হ'য়েছে।

এরপর বইখানির আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলতে হয়, কেবলমাত্র চৈতন্যপন্থীদের পক্ষেই নয়, দেশকাল ও সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল ধর্মার্থী, বিশেষ করে ভক্তিমার্গের সাধকমাত্রের পক্ষেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনাদর্শ ও ভাবধারার চর্চা, যে পরম কল্যাণকর, শিক্ষাপ্রদ ও আনন্দদায়ক সে বিষয়ে বোধহয় কোন মতভেদ নেই। নিজ অন্তরঙ্গ পার্ষদ বা ভক্তগণের সাথে মহাপ্রভুর যে 'কুসুমের চেয়েও কোমল' আবার 'বজ্রের চেয়ে কঠোর' ব্যবহার বা লীলাবিলাস, প্রধানতঃ সে-সবের মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে তাঁর এই অনুপম ভাব বা জীবনাদর্শের পরিচয়। কাজেই ধর্মার্থীমাত্রেরই আনন্দবর্ধন ও কল্যাণ-কামনায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য বা পার্ষদগণের মধ্যে রূপ-সনাতনের ন্যায় বিশিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর লীলাবিলাস ও সেইসাথে এঁদের প্রত্যেকেরই অসামান্য ত্যাগ-বৈরাগ্য ও গুরুভক্তির অপূর্ব কাহিনীকে উপজীব্য ক'রে পূর্বে যে-গ্রন্থখানি প্রকাশিত হ'য়েছিল, এবারে কিছুটা বর্ধিতাকারে সেটিকেই পুনঃপ্রকাশ করা হল। সেই সঙ্গে, আগের মতোই স্বতন্ত্রভাবে মহাপ্রভুর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তও গ্রন্থখানিতে সংযোজিত হ'য়েছে।

এবারে, মূল গ্রন্থখানিতে যে-সব বিষয়ে কোন বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা করা হয় নি, এমন দুই-একটি বিষয় সম্বন্ধে এখানে আনুষঙ্গিকভাবে কিছু একটু আলোচনা করা যাচ্ছে। শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মকে কেন যে 'প্রেমধর্ম' ব'লে বলা হ'য়ে থাকে, তার তাৎপর্যের কথায় মনে হয়—দু'টি প্রধান-প্রধান অর্থে কথাটিকে বুঝতে হবে। প্রথমটি—'প্রেমই ধর্ম' অর্থাৎ বৈষ্ণব বা ভক্তের পক্ষে ধর্ম

বা ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ— 'God is Love, Love is God'. দ্বিতীয়টি—'প্রেমের দ্বারা ধর্ম': পূর্ব-পূর্ব যুগের মতো ক'রে নরকবাস বা শাস্তির ভয়, কিংবা স্বর্গবাস বা পুরস্কারের লোভ না দেখিয়ে, কেবল প্রেম বা ভালবাসা দ্বারাই মানুষকে ধর্মপথে —সৎপথে—ঈশ্বরপথে আকৃষ্ট করা। পরমপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে বা আচরণে প্রেমধর্মের এ দু'টি অর্থেরই দেখা যায় পরিপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল প্রকাশ। বস্তুতঃ সত্যকার যে-প্রেম, তা কখনও মানুষকে ভীরু, দুর্বল, স্বার্থদুষ্ট বা কর্মবিমুখ করে না, বরং ক'রে তোলে তাকে ভয়শূন্য, অমিত বলশালী, নিঃস্বার্থ ও প্রাণচঞ্চল; যেমন দেখা যায় শ্রীচৈতন্যদেবের নিজের ক্ষেত্রেই। আর, সেইজন্যই তাঁর প্রবর্তিত যে-বৈষ্ণবধর্ম—যে-প্রেমধর্ম তাও অবশ্যই সাহসীর ধর্ম—সবলের ধর্ম—স্বার্থহীনের ধর্ম—প্রাণবন্তেরই ধর্ম! বৈষ্ণবের যে-দৈন্য, যে-ক্ষমা, যে-ত্যাগতিতিক্ষা, তাও প্রেম-প্রসূত। 'উত্তম হঞা [বৈষ্ণব] আপনারে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারের সহিষ্ণুতা ধরে বৃক্ষসম ॥' 'উত্তম' হওয়া সত্ত্বেও, পরমপ্রেমে বৈষ্ণব আপনাকে মনে করেন 'তৃণাধম' ব'লে। আর, এই 'দুই প্রকারের সহিষ্ণুতা' বলতে কী বুঝায়? না, 'কাটিলেহ তরু যথা কিছু না বোলয়। শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয় ॥' —শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক – চৈতন্যচরিতামৃত।

এভিন্নও শ্রীচৈতন্যদেবের অন্য যে-একটি উক্তি—'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর' সেদিক দিয়েও বলতে পারা যায়—স্বার্থপরতার যে-সংকীর্ণ দৃষ্টি, তাই-ই বস্তুতঃ প্রাকৃত দৃষ্টি—বিকৃত দৃষ্টি। অন্য পক্ষে প্রেমের যে-উদার—অসাম্প্রদায়িক—সর্বজনীন দৃষ্টি, তাই-ই প্রকৃতপক্ষে অপ্রাকৃত দৃষ্টি, যে-দৃষ্টিতেই 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে', কিংবা 'সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ' প্রতিভাত হয়; অথবা স্বামী বিবেকানন্দের মতো ক'রেই বলতে পারা যায়—'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

এর পরের কথাটি। গ্রন্থখানিতে শ্রীচৈতন্যদেবকে কোনরূপ অলৌকিক কিংবা অতিপ্রাকৃতিকভাবে চিত্রিত বা রঞ্জিত করার আদৌ কোন চেষ্টা করা হয়নি। কথা আছে, স্বভাবসুন্দর শ্রীরামচন্দ্রকে রাজবেশে সাজাতে দেখে কোন একজন প্রাচীন কবির মনে নাকি কাব্যের পুনরুক্তি দোষের কথাটারই উদয় হয়েছিল। অনুরূপভাবে, স্বভাবতঃ সুমহান শ্রীচৈতন্যচরিত্রকেও কোনরূপ অলৌকিক ঘটনার সমাবেশে মহত্তর ক'রে তুলতে যাওয়াটাকেও একটা নিরর্থক প্রয়াস ব'লেই ধ'রে নিতে হয়। অন্যদিকে, এরূপ চরিত্রকে কোন নতুন বা তথাকথিত আধুনিক সাজে সাজানোর কথাতেও মনে হয়, দেশকালের পরিবর্তনে সাধনপথ বা পদ্ধতির

পরিবর্তন ঘ'টে থাকে সত্য, কিন্তু তাতে ক'রে সাধ্যবস্তুর কোনই পরিবর্তন ঘটেনা, ঘটা সম্ভবপরও নয়! অন্য সকল জিনিসকেই কালে-কালে পরিবর্তিত হ'তে দেখা যায় বটে, কিন্তু সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের কোন পরিবর্তন—কোন সুলভ-সংস্করণ আজ পর্যন্তও সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি! শ্রীচৈতন্যের যুগে যে-মূল্য দিয়ে সাধককে ঈশ্বরলাভ করতে দেখা যায়, এযুগেও ঈশ্বরলাভ করতে হ'লে, তাকে অকাতরে সেই একই মূল্য দিতে হবে! 'নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'!

বইখানির বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্য একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। সে-যুগের শ্রীচৈতন্যকে বোঝবার পক্ষে এ-যুগের রামকৃষ্ণের ভাব বা অনুভূতি যথেষ্ট সহায়ক হবে আশা ক'রে, আলোচনাক্রমে শাস্ত্রীয় কোন-কোন শ্লোক ছাড়াও, বইখানিতে তুলনামূলকভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু-কিছু উক্তি বা বাণীরও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশেষে বক্তব্য—দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সাধ্য-সাধনতত্ত্বাভিজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কষ্টস্বীকার ক'রে বইখানির পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া প'ড়ে দেখে যে-ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন, বইখানির মূল্যায়নের পক্ষে সেটি বিশেষ সহায়ক হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এজন্য পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়কে ও সেই সঙ্গে ফার্মা কে. এল. এম.-এর প্রাণপুরুষ শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও তাঁর সহৃদয়তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, এখানেই 'নিবেদনটি' শেষ করছি। ইতি

বিনীত

শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সরকার

বিষয়-সূচী

লেখকের অন্যান্য বই

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও সর্বধর্ম-সমন্বয় (তাত্ত্বিক পর্যালোচনা)—পাঁচ টাকা

মহাভারতের উপাখ্যান (তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে)—পাঁচ টাকা।

রামচরিত মানসে—কাকগরুড় কথা—চার টাকা।

বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ (সংকলন গ্রন্থ)—দু' টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র (তাত্ত্বিক পর্যালোচনা)—দু' টাকা।

শ্রীচৈতন্যের শিষ্যব্যবহার

সনাতন-প্রসঙ্গে

শ্রীচৈতন্যদেব কি কোন একজন অবতারপুরুষ ছিলেন? থাকলে পূর্ণ, অংশ, না কলা? এসব বিচার-বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে অথবা ঈশ্বর-জীব-জগৎ, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর যে-অভিমত, সে-বিষয়ের কোন অবতারণা না ক'রে, কেবলমাত্র তাঁর অমল-ধবল চরিত্রমাধুর্যের কোন একটি দিক নিয়ে একটু চিন্তা করলেই, হতে হয় মুগ্ধ—চমৎকৃত! এমনি একটি দিকই হচ্ছে, অন্তরঙ্গ শিষ্য[1] অথবা ভক্তদের নিয়ে তাঁর যে লীলাবিলাস। এদিক থেকে ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীর সাথে প্রথম থেকেই তাঁর যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিচয়—ভাববিনিময় ঘটেছিল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে তারই একটু আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছে ক'রে, কুলিনগ্রাম থেকে এসে পৌঁছেছেন মহাপ্রভু রামকেলিতে। সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ লোক। তার মধ্যে রয়েছেন নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস ও আরও সব বড়-বড় গৌড়ীয় ভক্তেরা। খবর পেয়ে, গৌড়েশ্বর হুসেন শা'র দুই প্রধান অমাত্য দবীরখাস ও সাকরমল্লিক দুপুর রাত্তিরে লুকিয়ে এসে দেখা করলেন প্রভুর সাথে। এ'রা ছিলেন দু'ভাই। আর এ ছিল তাঁদের নবাবের দেওয়া নাম। হিন্দু নাম ছিল অন্য। অনেকদিন ধরেই দবীরের মনে বৈরাগ্যের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠছিল। সাকরমল্লিকেরও ছিল অন্তর্বৈরাগ্য। তাই দেখা হওয়া মাত্রই স্মরণ নিলেন দু'ভাই মহাপ্রভুর শ্রীচরণে। নতুন ক'রে তাঁদের নামকরণ হল—রূপ আর সনাতন ব'লে। অভয় দিয়ে বললেন প্রভু রূপ-সনাতনকে—

> জন্মে-জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার॥

কথা আছে—'মৎকৃপা বা মদ্ভক্ত কৃপা'! আর তাই বুঝি এরপরেই দেখা যায়—

> দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে।
> সবে কৃপা করি উদ্ধারহ এই দুইজনে॥

যাহোক এইভাবে উদ্ধারপর্ব শেষ হতে-না-হতেই, বলতে শোনা যায় সন্ত-

১। শ্রীচৈতন্যদেব আনুষ্ঠানিকভাবে কোন শিষ্যগ্রহণ করেননি। কাজেই এখানে শিষ্য অর্থে তাঁর অনুগামী, শাসনাধীন বা প্রপন্ন ব্যক্তিকেই বুঝতে হবে।

উদ্ধারিত সনাতনকে করজোড়ে—

ইহা হইতে চল প্রভু, ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥

বাৎসল্য রসে, বাপই ধরেন ছেলের হাত। আবার কখনও-বা ছেলেকেও ধরতে দেখা যায় বাপের হাত। তাই শুধু এইভাবে প্রভুকে সাবধান ক'রে দিয়েই ক্ষান্ত না হ'য়ে, আরও বললেন তাঁকে সনাতন—জোয়ান ছেলে বুড়োবাপকে কখন-কখন যেমন ক'রে সশ্রদ্ধ ভৎর্সনার সুরে ব'লে থাকে বুঝি-বা তেমনি করেই—

যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ-কোটী।
বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী॥
যদ্যপি বস্তুতঃ তোমার নাহি কোন ভয়।
তথাপি লৌকিকলীলা লোকচেষ্টাময়॥

'সখি, যাবত বাঁচি তাবৎ শিখি'! মহাপ্রভুর চরিত্রে এইভাবে শুধু সনাতনের মতো গুণবান লোকের কাছ থেকেই নয়, আপামর-সাধারণ সকলের কাছথেকেই শিক্ষাগ্রহণ, ছিল এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। সনাতনের আজকের এই-যে কথা, এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় তাঁর নিজের কথাতেও—'যদ্যপি যাও তুমি ভবসিন্ধুপার, তথাপি না ছাড়িবে লোকাচার'। আর, এ-শিক্ষাকেও কি নিয়েছিলেন তিনি নেহাৎ একটা লৌকিক শিক্ষা ব'লেই? এরও উত্তর দিয়েছেন তিনি নিজমুখেই মধ্যলীলা সপ্তদশ পরিচ্ছেদে—

ভক্তগণ লয়ে তবে চলিলাম রঙ্গে।
লক্ষকোটী লোক তাঁহা হইল আমা সঙ্গে॥
সনাতন মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা।
তাঁহা বিঘ্নকরি বনপথে লঞা আইলা॥

যেদিন ঘটনাটি ঘটেছিল, লোকে সেদিন হয়তো-বা অবাক হ'য়েছিল মহাপ্রভুর বিনয়—তাঁর শিক্ষাগ্রহণের রীতি দেখে। আর সেই সঙ্গে তাঁর সাথে প্রথম দিন থেকেই সনাতনের যে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার—গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রথম থেকেই স্থাপিত হ'য়েছিল যে-অভিনব মধুর সম্বন্ধ—তাও হয়তো সকলকেই মুগ্ধ—বিস্মিত ক'রেছিল। কিন্তু আসল যে-কথা—অন্তরের যে-ভাষা, তা সেদিন অজানাই র'য়ে গিয়েছিল! সেই গোপন কথাটিই পরে একদিন এমনিক'রেই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর মুখ দিয়ে—'সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিক্ষাইলা'! হাতীর থাকে দু'রকমের দাঁত। বাইরের যে-দাঁত—Show Teeth—তা লোকে বাইরে থেকে

দেখতে পায়। আর ভিতরের যে-দাঁত, যা দিয়ে সে খেয়ে বেঁচে থাকে, তা থাকে মুখের মধ্যে—লোকচক্ষুর আড়ালে। ব্যবহারিকভাবে কচ্ছেন বটে প্রভু সনাতনের প্রশংসা, কিন্তু অন্তরের অন্তরে জানছেন তিনি—দেখছেন তিনি, স্বয়ং কৃষ্ণই সনাতনের বেশে কচ্ছেন যা কিছু করবার—বলছেন যাকিছু বলবার!

(২)

দেখা যায় এরপর সনাতনকে বারাণসীধামে ভক্ত চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে প্রভুসঙ্গে। অনেক কষ্টে—অনেক দুর্গতি ভোগ করে—অনেক বিপদাপদ মাথায় নিয়ে, গৌড় থেকে পালিয়ে এসেছেন বারাণসীতে ও তারপর প্রভু চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে র'য়েছেন জানতে পেরে, এসে দাঁড়িয়েছেন সদর দরজায়। দীনহীন কাঙ্গালের বেশ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। গায়ে, আসবার পথে ভগ্নিপতি শ্রীকান্তের দেওয়া ভোটকম্বল একখানা। কাজেই, চেহারা দেখে মুসলমান দরবেশ ব'লে ভুলকরাটায় আশ্চর্য কিছুই ছিলনা। যাহোক, দেখা হ'ল 'দরবেশে'র প্রভুর সাথে।

তাহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা।
তারে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্টা হৈলা॥
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈলা সনাতন।
'মোরে না ছুঁইও' কহে গদ্‌গদ্ বচন॥
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার।
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার॥

এরপর—

শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গসম্মার্জন।
তিহোঁ কহে 'মোরে প্রভু না কর স্পর্শন'॥

একথার উত্তরে সেদিন সনাতনকে যা ব'লেছিলেন মহাপ্রভু, তাকে হয়তো স্বল্পদৃষ্টি মানুষের পক্ষে অতিশয়োক্তি ব'লেই ধ'রে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকত না, যদি কিনা এরপর তাঁকে নিয়ে যা-সব ঘটেছিল, আদৌ তা না ঘটতো!

প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥'

জানিনা, কোনো গুরু কোনো শিষ্যকে এমন কথা আর কখনও ব'লেছেন কিনা! যাহোক, করান হ'ল এরপর সনাতনের ক্ষৌরকর্ম, গঙ্গাস্নান ও বস্ত্রত্যাগ। নতুন কাপড় একখানি এনে দিলেন চন্দ্রশেখর। কিন্তু পসন্দ হ'লনা সনাতনের

নতুন কাপড় নেওয়াটা। বৈরাগ্য দেখে খুশি হলেন মহাপ্রভু। সাথে ক'রে নিয়ে গেলেন তাঁকে তপন মিশ্রের বাড়ীতে। সেখানে প্রসাদ পাওয়ার পরে, এল আবারও একখানা নতুন কাপড়। বিনয়ক'রে কাপড়খানি ফিরিয়ে দিয়ে, বললেন সনাতন মিশ্রকে—

মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার লয় মন।
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন॥

এরপর, এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণভক্তের সাথে সনাতনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। নিত্য প্রসাদ পাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন ব্রাহ্মণ সনাতনকে। কিন্তু অতে রাজী না হ'য়ে, জানালেন সনাতন ব্রাহ্মণকে—খাবেন তিনি মাধুকরী ক'রে। রোজ-রোজ ব্রাহ্মণের ঘরে খাওয়াটা ঠিক হবে না তার পক্ষে। শুনে খুশি হলেন মহাপ্রভু খুবই, কিন্তু চোখ ছিল তাঁর সবদিকেই। বলছেন তাই চরিতকার—

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।
[তথাপি] ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারবার॥

লোকে বলে, উত্তমভক্ত আকার-ইঙ্গিতেই বুঝে নেয় প্রভুর মনোভাব। কাজেই মোটেও দেরী হ'লনা সনাতনের পক্ষেও প্রভুর মনোভাব বুঝে নিতে। চট্ ক'রে একবার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একখানা কাঁথার সাথে ভোট-কম্বলখানি বদলে নিয়ে, কাঁথা গায়ে তাঁকে ফিরে আসতে দেখে, হেসে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু—ভোটকম্বলখানি কোথায় গেল, সনাতন? তারপর, যদিও ব্যাপারটা বুঝতে কিছুই বাকী ছিল না, তবুও সনাতনের মুখ থেকে সব কথা শুনে খুশি হয়ে—

প্রভু কহে 'উহা আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ?
রোগখণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষরোগ॥
তিনমুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্মহানি হয়, লোকে করে উপহাস॥'

এক কথা বলতে গিয়ে, এসে পড়ে আর এক কথা! দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের পরেই কেঁদে-কেঁদে স্তব ক'রে বলেছিলেন একদিন শ্রীরামকৃষ্ণও নরেন্দ্রনাথকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি ও আরও সব কত-কী, যার বিন্দুবিসর্গও সেদিন বুঝে উঠতে পেরেছিলেন না নিজে নরেন্দ্রনাথও। শুধু সেদিনই বা কেন? চিরদিনই সে-সব

কথা থেকে যেত অর্থহীন হয়ে, কেবল নরেন্দ্রনাথের কাছেই নয়, সারা বিশ্বের কাছেও, যদি-না পরজীবনে তাঁর রূপান্তর ঘট্‌তো বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ-রূপে। এছাড়া আরও মিল পাওয়া যায়, যখন এতসব স্তবস্তুতি সত্ত্বেও, দুদিক যেতে-না যেতেই শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা সেই নরেন্দ্রনাথকে নিয়েই। সামান্য একটু দোষ-ত্রুটিতেই কতই-না কঠোর শাসন!

(৩)

আরম্ভ হ'ল এবারে সনাতনের শিক্ষা। প্রথমেই প্রশ্ন করলেন সনাতন—

কে আমি? কেন আমায় জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়।
সাধ্য-সাধনতত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি॥

উত্তরে, সনাতনের কোন কথাই গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে—

প্রভু কহে 'কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয়।
সব তত্ত্ব জান, তোমার নাহি তাপত্রয়॥

কৃষ্ণশক্তিধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব॥'

উপনিষদের ঋষিকে শিক্ষাশেষে বলতে শোনা যায় শিষ্যদের—'মাতৃদেবো ভব'! 'পিতৃদেবো ভব'! 'আচার্যদেবো ভব'। আর, গুরুর-গুরু, আচার্যের-আচার্য শ্রীচৈতন্যের কথা শুনে, তাঁর শিষ্য-ব্যবহারের অলৌকিক রীতি দেখে, মনে হয়—তিনি যেন সনাতনের ন্যায় শিষ্যকে উপলক্ষ্য ক'রে, নিজেকে এবং সেই সাথে অন্যসকল গুরুকে—সকল আচার্যকেই বলতে চাইছেন—কেবল 'মাতৃদেবো ভব'! 'পিতৃদেবো ভব'! 'আচার্যদেবো ভব'! কেন?—'শিষ্যদেবো ভব'! কথায় বলে—'শিবরাম গুরুশিষ্য দোঁহে-দোঁহাকার'। শিষ্যদের প্রতি এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় মহাপ্রভুর যে-আচরণ, যে-শ্রদ্ধানিবেদন, তাতেও অনেক সময়েই বুঝে উঠা কঠিন হ'য়ে পড়ে—কে-যে শিষ্য, আর কেই-বা গুরু! এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই কি তাই তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন শিষ্যগ্রহণ করতেও দেখা যায় না? কে জানে? তবে এই সঙ্গে এও বলতে হয় যে, এসত্ত্বেও, লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু শিষ্য বা ভক্তদের পক্ষে বিন্দুমাত্র মর্যাদালঙ্ঘনও তাঁকে কেউ কখনও চুপক'রে স'য়ে যেতে দেখেনি।

সে যাহোক, অনেক কথার পরে যুগাবতারের কথায় ভাগবতের শ্লোক উল্লেখ ক'রে বললেন এবারে মহাপ্রভু সনাতনকে—

শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত ক্রমে চারিবর্ণ।
চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগ ধর্ম ॥

কিন্তু, শুধু শুনেগেলেই তো চলবে না, বুঝেও তো নিতে হবে! তাই এখন দেখা যায় (চৈতন্যচরিতামৃতের কথায়)—

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমতি ॥

কী কথা এখন 'পুছ্‌লেন' প্রভুকে, এমন যে সনাতন?

সনাতন কহে 'যাঁতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ কার্য প্রেমদান সংকীর্তন ॥
কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥'

পীতবর্ণ, আর সেই সাথে করছেন যিনি কলিযুগে প্রেমদান ও নামসংকীর্তন, শাস্ত্রের বচন ও প্রভুর কথা অনুসারে তিনি যে কে, সেই কথাটিই একবার তাঁর নিজ মুখ দিয়েই স্পষ্ট ক'রে বলিয়ে নিতে চান এখন সনাতন! কিন্তু প্রভুও তো বড় কম চতুর ছিলেন না! তাই এখন সনাতনের প্রশ্ন এড়িয়ে, পূর্বকথার অনুসরণ করেই—

প্রভু কহে 'চতুরালি ছাড় সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ' ॥

এমনি ক'রেই দু'মাস ধ'রে একের-পর-এক শিখান হ'ল সনাতনকে সকল তত্ত্বকথা। কৃষ্ণকথা বলতে-বলতে মাঝে-মাঝে ভাবের আবেগে দেখাদিত প্রভুদেহে —স্বেদ-কম্প-পুলক! আবার কখনো-বা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শোনা যেত তাঁকে খেদোক্তি করতে—

সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু!
মোর মন সান্নিপাতি সব পিতে করে মতি।
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় এক বিন্দু ॥[২]

কথাপ্রসঙ্গে একদিন জানিয়ে দিলেন প্রভু সনাতনকে, কী-কী কাজ তাকে

২। উপমাটিকে বুঝতে গিয়ে স্মরণ করতে হয় পুরানো দিনের চিকিৎসা পদ্ধতি, যে অনুযায়ী দারুণ পিপাসার্ত্ত হ'লেও সান্নিপাতিক রোগীর পক্ষে জলপান একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

করতে হবে তাঁর হ'য়ে। সব কথা শুনে ব'লেছিলেন সেদিন সনাতন প্রভুকে—যদি একান্তই আমাকে এতসব কাজ করতেই হয়, তবে এই ব'লে বর দাও প্রভু—'মুঞি যে শিক্ষাইলুঁ তোরে স্ফুরুক সকল!'—এই তোমার বর হইতে হবে মোর বল॥

[তথাস্তু!]

তবে মহাপ্রভু তার শির ধরি করে।
বর দিল—'এই সব স্ফুরুক তোমারে'!

(৪)

এরপর অন্ত্যলীলায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে। রথযাত্রার পরে ভক্তদের নিয়ে মহানন্দে চারমাস কাটিয়ে, বললেন প্রভু গৌড়ের ভক্তদের দেশে ফিরে যেতে। র'য়ে গেলেন শ্রীরূপ নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে দোলযাত্রা পর্যন্ত। পরে তাঁকেও, অনেক আদর-যত্নের পরে, একদিন বিদায় দিয়ে, বললেন প্রভু—

বৃন্দাবনে যাও তুমি, রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহ° পাঠাইও সনাতনে॥

নীলাচল থেকে গৌড় হ'য়ে চ'লেছেন রূপ বৃন্দাবনে। এদিকে, তাড়াতাড়ি ক'রে এসে পৌঁছানর আশায় মথুরা থেকে ঝাড়খণ্ডের বনপথ ধ'রেই নীলাচল রওনা হ'য়ে পড়েছেন সনাতন। পথে কখনও উপবাসেই দিন কেটে যায়। কখনও বনের ফলমূলই হয় সম্বল। নানা জায়গায় নানারকমের জল-হাওয়া; তারপর শরীরের দিকে আদৌ দৃষ্টি নেই—চ'লেছেন তো চলেছেনই! ফলে সারা গায়েই দেখা দিয়েছে ঘা-পাচড়া, তা থেকে আবার মাঝে-মাঝে রস গড়িয়ে পড়ছে! এইভাবে চলতে-চলতে, জগন্নাথ ক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পড়তেই মনে নির্বেদ উপস্থিত হ'ল সনাতনের—তাইতো! একে 'নীচজাতি'—অপবিত্রদেহ, তারপর এখন যা-অবস্থা তা'তে ক'রে জগন্নাথ দর্শন তো দূরের কথা, সদাসর্বদা প্রভুর দর্শন পাওয়াও সম্ভব হ'য়ে উঠবেনা আমার পক্ষে। শুনেছি তিনি মন্দিরের কাছাকাছিই থাকেন, যেখানে জগন্নাথের সেবকেরা নিত্য আনাগোনা করে। তাঁদের অঙ্গস্পর্শ হওয়াটা তো হবে আমার পক্ষে একটা অপরাধ! কাজেই সব চাইতে ভালো হয়, যদি রথযাত্রার দিন পর্যন্ত কোন একটা জায়গায় কাটিয়ে দিয়ে, রথের দিন জগন্নাথ ও সেইসঙ্গে প্রভুকেও দেখতে-দেখতে এই অপবিত্র দেহটাকে রথের চাকার নীচে বিসর্জন দিতে পারা যায়! তাতে একুল-ওকুল দু'কুলই রক্ষে হবে! এমনি সব ভাবতে-ভাবতে পৌঁছে গেলেন সনাতন নীলাচলে। মনে প'ড়ে গেল হরিদাসের

কথা। নিজেকে অপবিত্র মনে ক'রে, থাকতেন হরিদাসও মন্দির থেকে দূরে। খোঁজ করতে-করতে এসে পৌঁছিলেন সনাতন হরিদাসের কুটিরে। মিলন হ'ল দুই প্রভুভক্তের। কিন্তু যাঁর জন্য এত ছুটে-ছুটে আসা, তাঁর সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আর স্থির হ'তে পারছেন না সনাতন! আশ্বাস দিয়ে বললেন তাঁকে হরিদাস—এসে যাবেন প্রভু এখনই! জগন্নাথদেবের উপলভোগের পরেই ভক্তদের সাথে নিয়ে আসেন প্রভু রোজই একবার ক'রে হরিদাসকে দেখতে। এদিনও একটু পরেই এসে পড়লেন তিনি তেমনি ক'রেই। হরিদাস ও সনাতন দু'জনেই প্রভুকে দেখে, করলেন তাঁর চরণবন্দনা। এভাবে হঠাৎ এখানে সনাতনকে দেখে, প্রভুর কী আনন্দ! সাগ্রহে গেলেন তিনি তাঁকেও বুকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু না, সঙ্কুচিত হ'য়ে দু'একপা পিছু হ'টে, মিনতি ক'রে ব'লে উঠলেন সনাতন—

মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম তায় কণ্ডুরসা গায়॥

কে কার কথা শোনে! জোরক'রেই করলেন প্রভু তাঁকে আলিঙ্গন, আর তার ফলে সারা গায়েই লেগে গেল ঘা এর যত রস-কষ! এরপর একে-একে সকল ভক্তদের সাথেই করান হ'ল সনাতনের মিলন। সনাতনও করলেন তাঁদের যথাযোগ্য বন্দনা। এবারে মথুরার সকল বৈষ্ণবদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করার পরে, জানালেন প্রভু সনাতনকে দশমাস ধ'রে তাঁর সাথে রূপের নীলাচলবাসের খবর ও সেই সাথে ছোট ভাই অনুপমের মৃত্যুসংবাদটিও।

অনুপমের কথাতে অনেকক'রে মহাপ্রভুকে তার রামভক্তির প্রশংসা করতে শুনে, বলতে লাগলেন সনাতনও একে-একে, কেমন ক'রে ছোটকাল থেকেই দেখা যেত তাকে রঘুনাথের ধ্যানধারণায় দৃঢ়নিষ্ঠ,—কেমন ক'রে তিনি ও রূপ একদিন তার রামভক্তির পরীক্ষা করতে গিয়ে, ব'লেছিলেন তাকে রামভজন ছেড়ে কৃষ্ণ-ভজনে মন দিতে, আর তা শুনে সারারাত্রি কেঁদে কাটিয়ে পরের দিন ব'লেছিল সে—

রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা পাই বড় ব্যথা॥

* * *

রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবারে মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়॥

আরও বললেন সনাতন প্রভুকে, কেমন ক'রে এরপর বল্লভের (অনুপমের) কথা শুনে পরমপ্রীত হ'য়ে, তিনি ও রূপ দু'জনেই তাকে আলিঙ্গন ক'রে তার

রামভক্তির অনেক প্রশংসা ক'রেছিলেন। সব শুনে, প্রভুও বললেন কেমন ক'রে তিনিও একদিন রামভক্ত মুরারি গুপ্তের ভক্তির পরীক্ষা ক'রেছিলেন। কথা শেষে, আবেগভরে বলে উঠলেন প্রভু—

সেই ভক্ত ধন্য যে নাছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য যে নাছাড়ে নিজ জন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য [যে] তারে চুলে ধরি আনে॥

[এখানে এই ইষ্টনিষ্ঠার কথাতে মনে প'ড়ে যায় শ্রীহনুমানের উক্তিটি—'শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥' আর, উত্তম গুরুর লক্ষণের কথায় উল্লেখ্য, শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তম বৈদ্যের উপমাটি—বুকে হাঁটু দিয়ে ওষুধ খাওয়ানোর কথাটি। যাহোক, ফিরে যাওয়ার আগে ব'লে গেলেন প্রভু সনাতনকে—

ভাল হৈল তোমার ইহাঁ হৈল আগমনে।
এই ঘরে রহ ইহাঁ হরিদাস সনে॥
কৃষ্ণভক্তিরসে দুহেঁ পরম প্রধান।
কৃষ্ণরস আস্বাদহ লও কৃষ্ণনাম॥

(৫)

এমনি ক'রেই, কৃষ্ণনাম ক'রে-ক'রে আর পরমভক্ত হরিদাসের সাথে কৃষ্ণরস আস্বাদন করতে-করতেই আনন্দে কেটে যেতে থাকে সনাতনের দিনগুলো। প্রভুও আসেন রোজই একবার ক'রে, আর চলতে থাকে বেশ কতক্ষণ ধ'রে ইষ্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণকথা। হরিদাস বা সনাতন কেউ-ই আর যাননা শ্রীমন্দিরে, দূর থেকে মন্দির চূড়ো দেখেই প্রণাম করেন। মহাপ্রভুর আদেশে দু'জনের মতো যে-প্রসাদ দিয়ে যায় গোবিন্দ, তাতেই মিটে যায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা। এমন সময় একদিন, এসে পৌছান মাত্রই হঠাৎ বলতে আরম্ভ ক'রে দিলেন প্রভু সনাতনকে দেখেই—

সনাতন! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে।
কোটীদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
দেহত্যাগাদি এইসব তামস ধর্ম্ম।

তমোরজোধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম ॥

* * *

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীনছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার ॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান ॥

অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত করতে গিয়ে যেসব কথা বলা হ'য়েছিল, তা ভাবলে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আসল উদ্দেশ্যটা যে কী তা বুঝা কঠিন হ'য়ে পড়ে! অর্জুনকে দিয়ে কুরুকুলনিধন, ধর্মকর্মের প্রকৃত তত্ত্বের বিশ্লেষণ, সকল ধর্মমত ও পথের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান ; পুরাণের যুগে ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা নিয়ে সুরু হ'য়ে গিয়েছিল বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে যে-সংঘর্ষ তার প্রতিবিধান ; বেদের ক্রিয়াকাণ্ডের উপরে উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডের প্রাধান্য স্থাপন ; যুগধর্ম হিসাবে ভক্তিমার্গের উপযোগিতা-বর্ণন ও সেই সাথে অবতারবাদের সমর্থন ? কিংবা এসব ছাড়াও, আরও কত কী ? তেমনি আজ সনাতনকে উপলক্ষ্য করেও যা বলা হল, তার মধ্যে সনাতনকে আত্মহত্যা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা, ভক্তিধর্মের ব্যাখ্যা, সাধনতত্ত্বের গূঢ়রহস্যকথা ছাড়াও যদি কেউ ধর্মের মাধ্যমে আশু সমাজবিপ্লবেরও ইঙ্গিত পায়, তাতেও কিছু বলবার নেই। তবে এতসব কথা এদিন সনাতনের মনে উঠেছিল কিনা তা অবশ্য বলা শক্ত। হয়তো-বা আর্তভক্ত সনাতনের এদিন আর নিজের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাববার মতো আদৌ কোন অবসর ছিলনা। তারপর, নিজের মনের গোপন কথাটি যে প্রভু আপনা থেকেই জানতে পেরেছেন, এ দেখে তাঁর বিস্ময়ও গিয়েছিল সীমা ছাড়িয়ে !

এতশুনি সনাতনের হৈল চমৎকার।
প্রভুরে না ভায় মোর মরণ বিচার ॥
সর্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে ॥

'নীচ অধম মুঞি পামরস্বভাব।
মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ॥'

কিন্তু কী আশ্চর্য! সনাতনের প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া বা সেজন্য এতটুকুও 'আহা-উহু' করা তো দূরে থাক, বরং তাঁর আচরণে তিনি যেন কতই না ক্ষুব্ধ—কতই-না ব্যথিত—কত বিস্মিত, এমনি একটা ভাব দেখিয়েই—

প্রভু কহে 'তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে?
ধর্ম্মাধর্ম্মবিচার কিবা না পার করিতে॥'

বলতে পারা যায় না কি? নদীয়ার এই গোরারায়ই আবার পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রকেও 'আমি করব' বা ঐ রকমের কিছু একটা বলতে শুনে বুঝি বা এমনি করেই বিস্ময়ের স্বরে ব'লে উঠেছিলেন—'সে কিগো! তুমি না বকল্‌মা দিয়েছ? বলো, ঈশ্বরেচ্ছা হলে হবে।'

যাহোক এখানেই থেমে না গিয়ে, কি-কি কাজ তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেবেন বলে ঠিক ক'রে রেখেছেন, এরপর একে-একে সে-সবের কথা আবারও একবার সনাতনকে স্মরণ করিয়ে দিতে-দিতে আবেগরুদ্ধকণ্ঠে বলতে শোনা যায় প্রভুকে—

এতসব কর্ম্ম আমি যে-দেহে করিব।
তাঁহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব॥

অন্যদিকে, এতসব কথার ফলে প্রভুর সম্বন্ধে সনাতনের মনের অবস্থাটা যে এদিন কী দাঁড়িয়েছিল, তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তাঁর নীচের কথা-গুলোতে—

তবে সনাতন কহে 'তোমাকে নমস্কারে।
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
আপনে না জানে পুতলী কিবা নাচে গায়॥
তৈছে, যারে যৈছে নাচাও সে করে নর্ত্তনে।
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহো নাহি জানে॥

আবারও একবার এসে পড়ে—সেই বকল্‌মা দেওয়ার কথাটাই। এই বকল্‌মা দেওয়ার ফলে, ভক্ত গিরিশের জীবনেও এমন একদিন এসেছিল, যেদিন নিশ্বাস ফেলতে গিয়েও তাঁর মনে হয়েছিল—নিজের অহংকারের বশেই নিশ্বাসটা ফেলছি

নাকি তিনি ফেলাচ্ছেন তাই ফেলছি!

এবারে অন্য একটা দিক দিয়েও লক্ষণীয়—মহাপ্রভুর স্বভাবই ছিল, কেউ তাঁকে বড়-বড় কথা ব'লে প্রশংসা কচ্ছে দেখলে, তৎক্ষণাৎ অন্য কথা দিয়ে সে-কথা চাপা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। তাই সনাতনের স্তবস্তুতিতে কান না দিয়েই এখন—

হরিদাসে কহে প্রভু 'শুন হরিদাস!
পরের দ্রব্য ইহোঁ চাহেন করিতে বিনাশ॥
পরের স্থাপ্যদ্রব্য কেহো না খায় বিলায়।
নিষেধিও ইহায় যেন না করে অন্যায়॥'

দেখ-তো হরিদাস সনাতনের আক্কেলটা! কেউ যদি কারও কাছে কোন জিনিস গচ্ছিত রাখে, তবে ন্যায়ধর্মমতে সে-জিনিস কি কখনও খাওয়া চলে, না বিলিয়ে দেওয়া চলে? আর ইনি কিনা চাইছেন—তা নষ্ট ক'রে ফেল্‌তে! আশ্চর্য! বেশ ক'রে ব'লে দিওতো তুমি, যেন এমন অন্যায় কথা কখনও আর মনেও না আনেন! [লক্ষণীয়—এখানে নালিশটি কচ্ছেন স্বয়ং গুরুই কোন একজন শিষ্যের কাছে, অন্য একজন শিষ্যের নামে! যাহোক যার কাছে নালিশটি করা হ'ল, দেখা যাক তিনিই বা কি বলেন!]

প্রভুর কথা শুনে, সনাতনের সুরেই সুর মিলিয়ে—

'হরিদাস কহে মিথ্যা অভিমান করি।
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি॥
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে॥
এতাদৃশ তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার।
এ সৌভাগ্য ইহার, আর না হয় কাঁহার॥'

মা-এ, পো-এ মাম্‌লা! এক সওয়ালেই গেল চুকে! এরপর হরিদাস ও সনাতন দু'জনকে আলিঙ্গন ক'রে, এদিনের মতো ফিরে গেলেন প্রভু নিজের ডেরায়।

প্রভু চলে যাবার পরে, সনাতনকে জড়িয়ে ধ'রে তাঁর মহাভাগ্যের প্রশংসা করতে-করতে বলতে লাগলেন এবারে হরিদাস—

তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজধন।
তোমাসম ভাগ্যবান নাহি কোন জন॥
নিজদেহে যে-কার্য্য না পারেন করিতে।

সে-কার্য্য করাইবেন তোমা সেহো মথুরাতে ॥

* * *

ভক্তিসিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আচার-নির্ণয় ।
তোমাদ্বারে করাইবেন বুঝিল আশয় ॥

বলতে-বলতে খেদ ক'রে, বললেন নিজের কথায়—

আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ।
ভারতভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল ॥

মনে পড়ে, ব'লেছিলেন আগে একদিন চরিতকার সনাতনের বুদ্ধিবৃত্তির কথায়—'রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধে বৃহস্পতি'। সেই প্রখর বুদ্ধির অন্যতম পরিচয় ও সেইসাথে মহাপ্রভুর শিষ্যদের পরস্পরের প্রতি যে-প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল আরও এক উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায় সনাতনের পরের কথাগুলোতে, যা তাঁকে এখন বলতে শুনা যায় হরিদাসের এই কাতরোক্তিটির উত্তরে—

সনাতন কহে 'তোমাসম কেবা আছে আন ?
মহা প্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান ॥
অবতারকার্য্য প্রভুর নামপ্রচারে ।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমা দ্বারে ॥
প্রত্যহ কর তিনলক্ষ নাম সংকীর্তন ।
সবার আগে কর নামের মহিমাকথন ॥
আপনি আচরে কেহো না করে প্রচার ।
প্রচার করয়ে কেহো না করে আচার ॥
আচার-প্রচার নামের কর দুই কার্য্য ।
তুমি সর্বগুরু, সর্বজগতের আর্য্য ॥'

যাহোক এরপর—

এইমতে দুইজন নানা কথা রঙ্গে ।
কৃষ্ণকথা আস্বাদয়ে রহি এক সঙ্গে ॥

(৬)

দেখতে দেখতে আবারও এসে পড়ল রথযাত্রা। আগের বছরের মতোই এবারও এসেছেন নীলাচলে গৌড়ের ভক্তেরা। সকলে মিলে করা হ'ল আনন্দে রথযাত্রাদর্শন ও সেই সঙ্গে শ্রীপ্রভুর লীলাবিলাসসম্ভোগও। চারমাস পরে গৌড়ের

ভক্তেরা দেশে ফিরে গেলেন। থেকে গেলেন সনাতন প্রভুর সঙ্গে। আনন্দ ক'রে দেখলেন দোলযাত্রা ও আর-আর সব মহোৎসব। প্রভু ও ভক্তদের নিরন্তর সঙ্গের ফলে তাঁর মনের বিমর্ষভাব কেটে গিয়ে, দিনদিন আনন্দ বাড়তে লাগল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হ'তে দেখা যায় আগের জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিনের একটা ঘটনা—সনাতনের আসার একমাস পরের একটা ব্যাপার—যাতে ক'রে ক'রেছিলেন প্রভু সনাতনের তিতিক্ষার পরীক্ষা। ভক্তের আমন্ত্রণে এসেছেন প্রভু যমেশ্বর টোটায় ভিক্ষাগ্রহণ করতে। একেতো জ্যৈষ্ঠমাস, তারপর দুপুরবেলা। আগুনের হল্‌কা ছুটছে চারদিকে। সমুদ্রতীরের বালি তো হ'য়ে উঠেছে আগুন! এমন সময় ডাক পড়ল সনাতনের—তাঁকেও ভিক্ষাগ্রহণ করতে হবে প্রভুর সাথে যমেশ্বর গিয়ে। প্রভুর ডাকে মনের আনন্দে ছুটে চললেন সনাতন সমুদ্রতীরের পথ ধ'রেই। তাঁর এসে পৌঁছিবার আগেই, ভিক্ষা সেরে সবে একটু বিশ্রাম কচ্ছিলেন মহাপ্রভু। প্রসাদ পাবার পরে তাঁর সাথে দেখা হতেই, প্রথমেই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন—কোন পথে এলে সনাতন? উত্তরে বললেন সনাতন—'সমুদ্রপথে।' 'সমুদ্রপথে! কেন? এত তপ্ত বালুপথে না এসে, সিংহদ্বারের শীতল পথ দিয়ে এলে না কেন?—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় চোখ পড়েছিল প্রভুর সনাতনের পায়ের দিকে, আর তাই তাঁকে এই একই সঙ্গে ব'লে উঠতে শুনা যায়—

তপ্ত বালুকাতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ।
চলিতে না পার, কেমতে করিলে সহন॥

প্রভুর কথাতে এতক্ষণে হুস হ'ল সনাতনের। পায়ের দিকে চেয়ে দেখে তাই যেন একটু লজ্জিত হ'য়েই—

সনাতন কহে 'দুঃখ বহু না পাইল।
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল॥'

তারপর, কেন যে সিংহদ্বারপথে না এসে, এসেছেন সামুদ্রপথে, তার উত্তরে জানালেন সনাতন প্রভুকে নিতান্ত সঙ্কোচের সাথেই—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাহা সেবকপ্রচার॥
সেবকসব গতাগতি করে অবসরে।
কারও সহ স্পর্শ হৈলে সর্বনাশ হবে মোরে॥

খুশি হ'য়েছিলেন প্রভু আগেই সনাতনের তিতিক্ষা দেখে। আরও বেশী খুশি হলেন তিনি এখন তাঁর নিরভিমানতা, দেবদ্বিজেভক্তি ও সাধুসজ্জনের প্রতি

মর্যাদাবোধ দেখে। পরম তুষ্ট হ'য়ে তাই তাঁকে এখন বলতে শোনা যায় সনাতনকে লক্ষ্য ক'রে—

যদ্যপি হও তুমি জগৎপাবন।
তোমাস্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ ॥
তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্যাদারক্ষণ।
মর্যাদাপালন হয় সাধুর ভূষণ ॥
মর্যাদা রাখিলে তুষ্ট হৈল মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোনজন ॥

মহাপ্রভুর নীতিই ছিল—'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখায়।' তাই যে-সনাতনকে দিয়ে করাবেন তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্ব, তাঁকেও তো এইভাবে গ'ড়ে তুলতে চান তিনি তাঁর নিজের মতো করেই!

(৭)

এরপর কেটে গেছে প্রায় একটা বছর। অনেক পরিবর্তন ঘ'টে গেছে সনাতনের মনের, মহাপ্রভু ও ভক্তদের সঙ্গের গুণে। কিন্তু বার-বার নিষেধ করা সত্ত্বেও, প্রভু যে জোর করেই তাঁকে আলিঙ্গন করেন ও তার ফলে তাঁর শ্রীঅঙ্গে লেগে যায় ঘায়ের যত ক্লেদ, এটি প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে তাঁর পক্ষে। তাই একদিন ঘটনাক্রমে পণ্ডিত জগদানন্দের সাথে দেখা হ'য়ে যেতেই, মনের দুঃখে ব'লে ফেলেন তাঁকে সনাতন—

নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে।
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে ॥
* * *
হিতনিমিত্ত আইলাম হৈল বিপরীতে।
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে ॥

'কেন?'—সোজাসুজিই ব'লে ওঠেন জগদানন্দ, 'প্রভুতো আপনাদের দু'ভাইকে বৃন্দাবনে বাস করতেই আজ্ঞা দিয়েছেন। প্রভুর সাথে তো দেখাশুনোও হ'য়েছে। এবারে রথযাত্রার পরে আপনার পক্ষে বৃন্দাবনে ফিরে যাওয়াই তো ভালো। কথাটা সনাতনের কাছেও মন্দ লাগল না। তাই এরপর একদিন যখন আবারও প্রভু জোর করেই তাঁকে আলিঙ্গন করলেন, তখন আর তিনি না ব'লে থাকতে পারলেন না—

সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয়।
মোরে তুমি ছুঁইলে, মোর অপরাধ হয়॥
তাহাতে আমার অঙ্গে কণ্ডুরসা চলে।
তোমার অঙ্গে লাগে, তবু স্পর্শ তুমি বলে॥
তাতে ইহাঁ রহিলে মোর না হয় কল্যাণ।
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন॥
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল।
বৃন্দাবন যাইতে তিঁহ উপদেশ দিল॥

আর যায় কোথা! কথা শেষ হতে না হতেই, রেগে উঠে চরম বিরক্তির সাথে পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে বলতে আরম্ভ ক'রে দেন প্রভু—

কালিকার বড়ুয়া জগা, ঐছে গর্ব্বী হৈল?
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল॥
ব্যবহার-পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য।
তোমারেও উপদেশে নাজানে আপন মূল্য॥

সেই মর্যাদালঙ্ঘনেরই কথা! তবে এমনও হ'তে পারে, পণ্ডিত জগদানন্দ কোনরূপ উপদেশের ছলে কিংবা বুদ্ধির বড়াই ক'রেই কথাগুলো বলেননি। তা যাই হোক না কেন, শিষ্যদের বেলায়—তা তিনি যেমন ভাবেরই ভাবুক হোন না কেন—'কুসুমের চেয়েও কোমল, আবার বজ্রের চেয়েও কঠোর' মহাপ্রভুর কাছে কোন ব্যবহারিক ভাবের এতটুকু ব্যতিক্রমও যে উপেক্ষার বিষয় ছিল না, তার প্রমাণ শুধু এইভাবে এখানেই নয়, 'চৈতন্যচরিতের' সর্বত্রই অনায়াসে পাওয়া যেতে পারে।

সে যাহোক, হালফিল যা দেখা যায় তাতে কিন্তু প্রভুর কথার আশু ফল হ'ল উল্টো! কোনরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করা কিংবা পণ্ডিতের উপরে বিরূপ হওয়া দূরে থাক্—

শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল।
জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল॥
আপনার দৌর্ভাগ্যের আজি হইল জ্ঞান।
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান॥
জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধাধারে।
মোরে পিয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্বনিশিন্দসারে॥

আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তাজ্ঞান।
মোর অভাগ্য, তুমি স্বতন্ত্র ভগবান ॥

হরি! হরি! এমনটি না হ'লে, কি আর শুধু শুধুই বলা হ'য়ে থাকে—ভক্ত-ভগবানের এই লীলা—এই রূপ দেখতে, দেবতারাও স্বর্গ থেকে নেমে আসেন! 'দেবাঅপ্যস্যরূপস্য নিত্যদর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ।' অভিমানী বালকের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে এতক্ষণ ধ'রে যা সব বললেন সনাতন তার অর্থ—লোকে যারে আত্মীয় ব'লে মনে করে, কেবল তারেই তো দোষ-ত্রুটির জন্য ভৎ'সনা ক'রে থাকে। অন্য পক্ষে, যে পর, সে কেবল প্রশংসার ভাগীই হ'য়ে থাকে! তবে, এত দিনেও যে আমার প্রতি তোমার আত্মীয়তাবোধ জন্মালনা সে তো আমারই অদৃষ্টের দোষ। সেজন্য তোমাকে আর দায়ী করি কি ক'রে বলো! তুমি তো সাক্ষীস্বরূপ—নিরপেক্ষ দ্রষ্টাস্বরূপ—স্ব-তন্ত্র ঈশ্বর!

দেখা যায়, সনাতনের কথাতে—তাঁর এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাব-ভঙ্গিতে, সেদিন বেশ-একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে পড়তে হ'য়েছিল মহাপ্রভুকে।

শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে।
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে ॥
জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে।
মর্যাদালঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে ॥
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রধান।
কাঁহা জগা কালিকার বড়ুয়া নবীন ॥
আমাকেও বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি।
কতঠাঞি বুঝাঞাছ ব্যবহার-ভক্তি ॥

মহাপ্রভুর আজকের এই কথাতে স্মরণীয়—সেই রামকেলিতে প্রথম দর্শনের দিনে, তাঁর বৃন্দাবন যাওয়ার কথা শুনে তাঁকে যা বলেছিলেন সনাতন—'যাঁহা সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটী। বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটি।' দেখা যায়, গভীর ভাবেই মনে ক'রে রেখেছিলেন তিনি কথাটি। তবে শুধু এই কথাটিই কেন? যখনই, যার কাছ থেকেই হোক, গ্রহণ করতেন তিনি কোন শিক্ষা, তখনই রেখে দিতেন তিনি তা পরম যত্নে নিজের অন্তরের অন্তরে।

যাহোক, বোধ হয় আর না বললেই নয়, তাই এবারে একে-একে বলতে শুনা যায় প্রভুকে তার অন্তরের কথা,—কেন তিনি সনাতনের গায়ের ক্ষত সত্ত্বেও তাঁকে আলিঙ্গন করেন,—করেন তাঁর এত সব প্রশংসা—

বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমায় না করি স্তবন।
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ ।।
যদ্যপি কারও মমতা বহুজনে হয়।
প্রীতিস্বভাবে কাঁহাতে কোন ভাবোদয় ।।

মনে হয় এ থেকেই বুঝা যায়, গীতার 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ;—একই সমদর্শী ভগবান কেন যে ভক্তের ভাবানুযায়ী বিশেষ-বিশেষভাবে ধরা দেন, তার তাৎপর্য। এরপর সনাতনের ভুক্তভক্তের কথায় বলতে শুনা যায়—

তোমার দেহে তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান।
তোমার দেহ আমার লাগে অমৃত সমান ।।
অপ্রাকৃত দেহ তোমার, প্রাকৃত কভু নয়।
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয় ।।
প্রাকৃত হইলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে।
ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে ।।

* * *

আমিত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম।
চন্দনপঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম ।।
এই লাগি তোমায় ত্যাগ করিতে না যুয়ায়।
ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম্ম যায় ।।

সেই যখন সনাতনকে দেহত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন মহাপ্রভু, তখনকার তাঁর সে-সব যুক্তি তা যেমন শুধুই স্নেহপ্রসূত ছিল না, ছিল অকাট্য শাস্ত্রসিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, ঠিক তেমনিভাবেই তাঁর এবারের কথাগুলোও কোন ছেলে-ভোলান কথা নয়, সমানভাবে সুদৃঢ়দার্শনিকতত্ত্ব-ভিত্তিক। প্রসঙ্গক্রমে স্মর্তব্য—উত্তম অধিকারী সম্বন্ধে মধ্যলীলায় যেমন বলা হয়েছে—

শাস্ত্রযুক্তে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী তিহঁ তরয়ে সংসার ।।

স্বয়ং অবতারপুরুষ হ'লেও, মহাপ্রভুর নিজের ক্ষেত্রেও কিন্তু এ'দুটি লক্ষণের কোন একটিরও কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

সে যাই হোক, এরপর দেখা যায়, প্রভুর কথাতে একেবারে 'থ' হ'য়ে গেছেন সনাতন। অন্যপক্ষে পুরানোভক্ত হরিদাস কিন্তু অতো সহজে ছাড়বার পাত্র

ছিলেন না। বিশেষ ক'রে, 'আমিত সন্ন্যাসী'···'সমদৃষ্টিই আমার ধর্ম'—এইসব কথাগুলো তাঁর মোটেই ভালো লাগছিল না। তাই, এতে আপত্তি জানিয়ে যা তাঁকে এখন বলতে শুনা যায়, তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে,—তা বললে তো চলবে না প্রভু! আমাদের মতো পতিত—অধমকে তুমি যে অঙ্গীকার ক'রেছ, এতেই তো প্রমাণ হয়ে গেছে যে, এসব তোমার বাহ্য প্রতারণামাত্র! আসলে তুমি দীনদয়াল, পতিতপাবন! দীনের প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্ব আছেই আছে। [প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় মহাপ্রভুর নিজের উক্তিটিও—'দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান। কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥'] কাজেই কেবল হরিদাসের কথাতেই নয়, নিজের কথাতেও এখন ধরা প'ড়ে গিয়ে—

প্রভু হাসি কহে 'শুন হরিদাস সনাতন।
তত্ত্বকহি তোমাবিষয় আমার যৈছে মন॥'

বলতে-বলতে, ভক্তের ভগবানকে বিরক্ত সন্ন্যাসীর বেশ ছেড়ে, স্নেহময়ী জননীর বেশে এরপর ব'লে যেতে শুনা যায়—

তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালক অভিমান।
লালকের লাল্যে নহে দোষপরিজ্ঞান॥
আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান।
তোমাসবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান॥
মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়।
ঘৃণা নাহি জন্মে, আরও মহাসুখ পায়॥
লালামেধ্য লালকের চন্দনসম ভায়।
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না জন্মায়॥

এত কথার পরে, কী আর বলা চলে? তবুও কিন্তু বললেন হরিদাস সেই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত পরমভক্ত বাসুদেবের কথা তুলে—

বাসুদেব গলৎকুষ্ঠ, অঙ্গকীড়াময়।
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়॥
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ।
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ॥

হরিদাসের এবারের এই যে কথাগুলো, এর ইঙ্গিত যাই হোক না কেন, সেদিকে আদৌ মনোযোগ না দিয়ে, এরপর দেখা যায় মহাপ্রভুকে গোটা ব্যাপারটাই তাঁকে তত্ত্বতঃ বুঝিয়ে বলতে—

প্রভু কহে—'বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণভজয় ॥'

লক্ষণীয়—শারীরিক রোগ অথবা বাহ্যশরীর নিরাময়ের কোন কথারই উল্লেখ দেখা যায়না এখানে মহাপ্রভুর কথাগুলির মধ্যে। অন্যপক্ষে কৃষ্ণে ঠিক-ঠিক আত্মসমর্পণকারী বৈষ্ণব বা ভক্ত যে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে, চিন্ময় বা চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হন, কথাগুলিতে তারই সুস্পষ্ট আভাস দিতে দেখা যায় তাঁকে।

যাহোক, এইভাবে এখানেই বক্তব্য শেষ না ক'রে আগের কথার জের টেনে এরপর আরও এমন একটা কারণের উল্লেখ করতে দেখা যায় মহাপ্রভুকে যেজন্য তিনি কোনমতেই কণ্ডুগ্রস্ত সনাতনকে আলিঙ্গন না করেই পারেন না—

সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজায়া।
আমা পরীক্ষিতে ইহাঁ দিল পাঠাইয়া ॥
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে।
কৃষ্ণঠাঞি অপরাধী হইতাম তবে ॥

শাবাশ! সত্যিই ব'লেছেন চরিতকার—

চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটী সমুদ্র হৈতে।
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে ॥

এরপরেও, বললেন প্রভু সনাতনকে আরও কিছুদিন তাঁর সাথে নীলাচলে থেকে যেতে, ও তারপর তাঁর বৃন্দাবনে ফিরে যাবার আগে আবারও একবার করলেন তাঁকে আলিঙ্গন, যার ফলে (যেমন বল্‌তে শুনা যায় চরিতামৃতে)—

'কণ্ডু গেল, অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম।'

এখানে এই 'সুবর্ণের সম' কথাটিতে মনে এসে যায় চৈতন্যচরিতামৃতেরই অন্য একটি উক্তি

লোহাকে যাবত স্পর্শ হেম নাহি করে।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ॥

কাজেই এথেকে বলতেই হয়, মহাপ্রভুর এবারের এই স্পর্শের গুণে, সনাতনের

অন্তর-অঙ্গই হ'য়ে থাকুক্ 'হেমময়' কিংবা তাঁর বাইরের অঙ্গটাই হ'য়ে থাক্ 'স্বর্বর্ণসম', যার ফলে, বা যেমনকরেই হোক, তিনি যে চিনতে পেয়েছিলেন মহাপ্রভুকে 'স্পর্শমণি' ব'লে, তাতেই তিনি হ'য়েছিলেন ধন্য—হয়েছিলেন নিজেও আর একটি পরশমণি।

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, সুপ্রাচীন বায়বীয় সংহিতাদিতেও বলা হয়েছে যে শাম্ভবীদীক্ষার কথা; অর্থাৎ 'গুরোরালোকমাত্রেন, স্পর্শেন, সম্ভাষণাদপি' কিনা, সৎগুরুর দর্শন, স্পর্শন, বা সম্ভাষণমাত্রেই শিষ্যের জ্ঞানোদয় বা তার মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হওয়ার কথাটা। মনে হয়, এরূপ দীক্ষার অর্থও এইভাবে দীক্ষিতের পক্ষে 'স্পর্শমণিস্পর্শে হেমময় হ'য়ে যাওয়াই'!

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—'পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়ে যায়। লোহার তরোয়াল সোনার তরোয়াল হয়ে যায়। তরোয়ালের আকার থাকে, কারু অনিষ্ট করে না। সোনার তরোয়ালে মারাকাটা চলে না'।

হরিদাস ঠাকুর প্রসঙ্গে

(১)

জননী শচীদেবী ও ভক্তদের কাছে বিদায় নিয়ে চিরদিনের মতো নদীয়া ছেড়ে চ'লে যেতে দেখে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন হরিদাস মহাপ্রভুকে —

নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি ?
নীলাচল যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥
মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন ।
কেমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ?

উত্তরে তাঁকে প্রবোধ দিয়ে—

প্রভু কহে—'কর তুমি দৈন্য সম্বরণ ।
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন ॥
তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন ।
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম ॥

এরপর দেখা যায় একদিন, নদীয়া থেকে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দুশোজন ভক্ত শ্রীক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন হরিদাসও। সিংহদ্বার ছেড়ে খানিকটা এগিয়ে যেতেই, দেখা হ'ল সকলের মহাপ্রভুর সাথে। সকলকে সঙ্গে নিয়ে কাশীমিশ্রের বাড়ীতে নিজের ডেরায় পৌছে, এক-এক ক'রে—

সবারে সম্মানি প্রভুর হৈলা উল্লাস ।
হরিদাসে না দেখিয়া কহে 'কাঁহা হরিদাস' ॥

ওদিকে— দূর হইতে হরিদাস গোঁসাঞি দেখিয়া ।
রাজপথ-প্রান্তে পড়ি আছে দণ্ডবৎ হঞা ॥

প্রভুর কথা শুনে ছুটে এলেন সকলে হরিদাসকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে। কিন্তু কোনমতেই তাতে রাজী না হ'য়ে—

হরিদাস কহে 'আমি নীচ জাতি ছার ।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার ॥
নিভৃতে টোটামধ্যে স্থান যদি পাই ।
তাঁহা পড়ি রহোঁ, একলে কাল গোঁয়াঞি' ॥

হরিদাসের এই দৈন্যের কথাতে মনে এসে যায়, শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত নাগমশায়েরও

একদিনের একটা কথা। বারবারই বলছিলেন সেদিন নাগমশায় শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের কাছে, নিজেকে—'পাপী-পাপী' ব'লে। শ্রীরামকৃষ্ণের জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্যও ছিলেন সেখানে উপস্থিত। শুনেছিলেন তিনি ৺ঠাকুরের মুখে—'যে নিজেকে 'পাপী' বলে, সে পাপীই হ'য়ে যায়'। তাই বারবার নাগমশায়কে ওকথা বলতে শুনে, ৺ঠাকুরের কথার উল্লেখ ক'রে নিষেধ করলেন তিনি তাঁকে ওরূপ করতে। জানতেন কথাটা নাগমশায় নিজেও ; আর গৃহীই হোন বা সন্ন্যাসীই হোন, ৺ঠাকুরের সকল শিষ্যদের প্রতিই ছিল তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। কিন্তু যা সত্য—জ্বল্ জ্বল্ কচ্ছে যা তাঁর চোখের সামনে, তাকে আর অস্বীকারই বা করেন কী ক'রে ? তাই, কাতর হ'য়ে ব'লে উঠতে শোনা যায় তাঁকে—'কী করি কী করি বলুন ! আমি যে দেখতে পাচ্ছি—আমি পাপী—আমি পাপী !' যাহোক, দুজনেরই কথা শুনে, বলেছিলেন সেদিন গিরিশবাবু সাধুটিকে—'বলতে দাও ওঁকে ওকথা। ওঁর পক্ষে ওতে কোন দোষ হবেনা !' সেই একই কথা বলতে হয় পরমভক্ত হরিদাসের সম্বন্ধেও। এই যে দৈন্য, এছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈষ্ণবের ভূষণ—অপার্থিব সম্পদ ! সে যাহোক—

এই কথা লোকে গিয়া প্রভুকে কহিল।
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল ॥

কিন্তু কাউকেই নিজ মনোভাবের কোন আভাস না দিয়ে, একে-একে সকল ভক্তদের বিদায়ের পরে এলেন প্রভু একা-একাই হরিদাসের কাছে। দেখামাত্রই পায়ে দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়লেন হরিদাস। প্রভুও তাঁকে বুকে তুলে নিয়ে করলেন আলিঙ্গন। তারপর (বলছেন চরিতকার)—

দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে।
প্রভুগুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্যগুণে ॥

একটু সামলে নিয়ে, স্বভাবসুলভ অনুনয়-বিনয় ক'রে—

হরিদাস কহে 'প্রভু না ছুঁইও মোরে।
মুঁই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে' ॥

মনে হয়, কথাগুলো ব'লে ভালই করেছিলেন হরিদাস। তা নাহ'লে কেমন ক'রে আর শোনা যেত এরপর এদিন যা-সব ব'লেছিলেন তাঁকে মহাপ্রভু,—কেমন ক'রেই বা আবারও একবার দেখা যেত কত গভীর শ্রদ্ধার সাথে করতেন তিনি শিষ্যদের সাথে আলাপ-ব্যবহার !

প্রভু কহে 'তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে ॥

ক্ষণে-ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থ-স্নান।
ক্ষণে-ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ-দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন'॥

এই প্রসঙ্গে, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে হয় চরিতকারের নিজস্ব উক্তিটিও –

ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে।
মহাপ্রভুসম আর নাহি ত্রিজগতে॥

এবং সেইসঙ্গে অন্য একদিন ভক্তপ্রবর সনাতনের সম্বন্ধেও যেমন বলতে শোনা যায় নিজে মহাপ্রভুকে, সে-কথাটিও—

প্রভু কহে—'তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে'॥

কথা প্রসঙ্গে প্রশ্ন জাগে—হরিদাস বা সনাতন সম্বন্ধে মহাপ্রভুর এই যে-সব উক্তি, একি বস্তুতঃ কেবলমাত্র তাঁদের মহিমা বাড়ানো বা সুখ দেবার জন্যই? নাকি—শ্রীরামকৃষ্ণের যে-উক্তিটি, 'ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, তিন-এ এক, এক-এ তিন' অর্থাৎ খুঁজে দেখলে, এঁদের যে-কোন একটির মধ্যেই তিনটিরই সন্ধান পাওয়া যেতে পারে, সে-অনুসারে বুঝতে হবে- উত্তমভক্ত সনাতন বা হরিদাসের মধ্যে ভক্তভাবে-ভাবিত মহাপ্রভু সেদিন স্বয়ং কৃষ্ণকেই দেখেছিলেন বলেই করেছিলেন এত সব স্তবস্তুতি। এছাড়াও মনে হয়- মহাপ্রভুর অবতারত্বের মূল প্রয়োজনটিই যখন ছিল শুদ্ধা ভক্তির প্রচার, তখন সেদিক থেকে পরমভক্ত হরিদাস বা সনাতনকে পেয়ে পূর্ব-পূর্ব যুগের বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ-দান-তপস্যা কিংবা তীর্থকৃত্যাদি অপেক্ষাও যে, এযুগে ভক্তির মাহাত্ম্যই অধিক, বেদধ্যায়ী ব্রাহ্মণ অথবা জ্ঞান বা যোগমার্গী সন্ন্যাসীর চেয়েও যে ঈশ্বরভক্তের সঙ্গ বেশী পবিত্রকারী, তারও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেবার মতো সুবর্ণ সুযোগও এসে উপস্থিত হয়েছিল। অন্যদিক দিয়েও আবার, তাঁর নিজের যে-উক্তিটি—'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥' তাঁকেও এখন, হরিদাস বা সনাতনের প্রতি তাঁর নিজের এরূপ আচরণের দ্বারা তিনি কেবল আপন ভক্ত বা শিষ্যদের মধ্যেই নয়, জনসাধারণের চোখেও সুপ্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর ক'রে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সে যাহোক, এভাবে এখানে হরিদাসের এত সুখ্যাতি করা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লৌকিক ব্যবহার থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হ'তে দেখা যায় না মহাপ্রভুকে।

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে।
অতি নিভৃতে সেই গৃহে দিল বাসস্থানে॥

এরপর বললেন প্রভু হরিদাসকে—

এই স্থানে রহ, কর নাম সংকীর্তন।
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঁঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥

(২)

এমনি করেই নিরন্তর কৃষ্ণনাম ও সেই সাথে প্রভু ও ভক্তদের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী ক'রে-ক'রে কাটতে থাকে হরিদাসের দিন। কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন একদিন প্রভু—'আচ্ছা বলতো হরিদাস, কলিকালে এই-যে এত-সব দুরাচার যবনেরা, যারা সর্বদাই কচ্ছে গো-ব্রাহ্মণের হিংসা, এদের কি ক'রে নিস্তার হবে?' কথা শুনে, মুহূর্তমাত্রও দেরী না ক'রে ব'লে ওঠেন হরিদাস—'কেন প্রভু! এর জন্য আর ভাবনা কী! মহাপ্রেমে মত্ত হ'য়ে ভক্তেরা যে-নাম গ্রহণ করে, হেলায়ই হোক আর শ্রদ্ধায়ই হোক—অশুদ্ধভাবেই হোক আর শুদ্ধ ভাবেই হোক, সেই পতিত পাবন নামই তো এরাও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছে! কাজেই নামের মাহাত্ম্যেই যে এরাও উদ্ধার হয়ে যাবে, তার প্রমাণ তো শাস্ত্রেই রয়েছে—অজামিল উপাখ্যানে।' হরিদাসের কথা শুনে খুশি হলেন প্রভু খুবই, কিন্তু মুখে তার কোনই আভাস না দিয়ে, আবারও জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে—[আচ্ছা, তা না হয় হোলো কিন্তু] "পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম। ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?" এবারের উত্তরের জন্যও যেন আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়েই ছিলেন হরিদাস!—'কেন প্রভু, তাদেরও তো নিস্তার হয়েই রয়েছে। তুমি যে উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্তন করেছ, তা শুনেই তো জঙ্গমের সংসার ক্ষয় হয়ে গেছে। আর স্থাবরের কথা? তোমার সংকীর্তনের যে-প্রতিধ্বনি, সে তো প্রতিধ্বনি নয়! সে-যে স্থাবরেরই কীর্তনের শব্দ! সারা জগৎ ধরে চলেছে যে-অবিরাম নামসংকীর্তন, তার তালেই তো তাল দিয়ে—

শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম।

* * *

উচ্চসংকীর্তন তাতে করিয়া প্রচার।
স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥

নামসিদ্ধ হরিদাসের কাছে, নামমাহাত্ম্যে সবই সম্ভব! তাছাড়া, যে নিজে মুক্ত, অন্যকেও সে মুক্তই দেখে থাকে। বদ্ধত্বের ভাব তাঁর কাছে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভান মাত্র! এবারে তৃতীয় প্রশ্ন—[তা বেশ! তবে] 'সর্বজীব মুক্তি যবে পাবে। এই ত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীবশূন্য হবে!—তা'হলে কী হবে হরিদাস?' যেন কতই না চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করে বসেন প্রভু। বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ—'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?' তা, বোকা তো ছিলেনই না হরিদাস ঠাকুর, ছিলেন তিনি চতুর-চূড়ামণি! ['যেইজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর' - নরোত্তম দাস] আর মহাপ্রভুর কথাতে বলতে গেলেও বলতে হয়—'পৃথিবীর শিরোমণি'। তাই এবারে, শুধু ভক্তিতেই নয়, অকাট্য শাস্ত্রযুক্তি দিয়েই—

হরিদাস বলে 'তোমার যাবত মর্ত্তে স্থিতি।
তাঁহা যত স্থাবর-জঙ্গম জীবজাতি॥
সবা মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে।
সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে॥
সূক্ষ্মজীবে হবে ইহা স্থাবর জঙ্গম।
তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্বসম॥'

তবে কেবল হরিদাসকেই নয়, অন্যান্য অবতারের বেলাতেও ভক্ত বা পার্ষদগণকে অনুরূপ কথাই বলতে শুনা যায়। নিজে হরিদাসকেই এখানে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের কথায় বলতে শুনা যায়—

রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া।
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্যজীব অযোধ্যা ভরিয়া॥

* * *

পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার।
সকল ব্রহ্মাণ্ড জীবের খণ্ডাইল সংসার॥

ব্যাপারটি যে নিতান্তই দুর্বোধ্য, বিশেষ ক'রে সাধারণ মনোবুদ্ধির পক্ষে, সে-কথা অবশ্যই অনস্বীকার্য। গীতার উক্তি অনুযায়ীও কোন অবতারপুরুষের 'দিব্যজন্ম ও কর্ম' সম্বন্ধে 'তত্ত্বজ্ঞান' লাভ না হওয়া পর্যন্ত কেবলমাত্র তাঁর দর্শন বা সান্নিধ্য লাভের ফলেই পুনর্জন্ম নিবারিত হওয়া সম্ভব নয়। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পরমভক্ত হরিদাস এইভাবে অবতারের আবির্ভাবের ফলকে অমোঘ ব'লে প্রচার করলেও কিন্তু, তাঁর যে-উক্তিটি 'সূক্ষ্মজীবে পুনঃ কর্ম উদ্বুদ্ধ করিবে' ইত্যাদি, তাদ্বারা তিনিও গীতার সিদ্ধান্তেরই অনুবর্তন করেছেন মাত্র। —'ধ্রুবংজন্ম মৃতস্যচ'।

যাহোক হরিদাসের কথাশুনে, তার বিশ্বাসভক্তির বহর দেখে, মুগ্ধ হলেন মহাপ্রভু, কিন্তু মুখে 'হাঁ' বা 'না' কিছুই আর না ব'লে, মনের আনন্দে তাঁকে কেবল আলিঙ্গনই করলেন। এরপর অবশ্য দেখা যায়, ভক্তদের কাছে হরিদাসের প্রশংসায় তিনি এদিন একেবারে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন।

(৩)

দিন যায়। একদিন প্রসাদ দিতে এসে দেখেন গোবিন্দ শুয়ে-শুয়ে অতি ধীরে-ধীরে নামকীর্তন কচ্ছেন হরিদাস। শরীর অসুস্থ; তাই নামসংখ্যা পূর্ণ ক'রে উঠতে পারেন নি ব'লে স্থির ক'রেছেন, থাকবেন সেদিন অনাহারে। কিন্তু প্রসাদান্ন, তাই এককণা মুখে দিতেই হ'ল। এরপর অন্যদিন প্রভুর সাথে দেখা হ'তেই বললেন যখন তিনি তাঁকে মিষ্টি ক'রে—'আর কেন হরিদাস! বুড়ো হ'য়েছ এবারে নামসংখ্যা কমিয়ে ফেল' তখন তার উত্তরে কিছু আর না ব'লে, জানালেন কেবল তাঁকে হরিদাস তাঁর অন্তিম প্রার্থনাটি -

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে।
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিতে ॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাডিবা ॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার [ও] চাঁদবদন ॥
জিহ্বায় উচ্চারিবে তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ ॥

ভক্তের কথায় রাজী হ'তেই হ'ল প্রভুকে, যদিও মুখফুটে বললেন না আর কোন কিছু। পরদিন জগন্নাথ দর্শনের পরে এসেছেন মহাপ্রভু ভক্তদের নিয়ে হরিদাসকে দেখতে। কুশল জিজ্ঞাসার পরেই শুরু হ'য়ে গেল উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন। হরিদাসের গুণের কথা আজ আর ব'লে শেষ ক'রে উঠতে পারছেন না প্রভু। বিস্মিত ভক্তেরা একে-একে হরিদাসের পায়ের ধুলো নিতে লাগলেন। এরপর ঠিক যেমনটি ইচ্ছে ক'রেছিলেন, সেইভাবেই দেহত্যাগ করলেন হরিদাস। দেখে-শুনে অনেকেরই মনে এদিন ভেসে উঠেছিল ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যুর ছবিটি। আরম্ভ হ'য়ে গেল এবারে হরিদাসের দেহটি নিয়ে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে নৃত্য ও সেইসাথে ভক্তদের প্রেমোল্লাস। অনেকক্ষণ এভাবে কেটে যাবার পরে, দেহটি সমুদ্রতটে নিয়ে গিয়ে—

হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে 'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল'॥

সকলের আগেই হরিদাসের সমাধিতে প্রভু নিজ হাতে বালি দিলেন। তারপর শেষকৃত্য সেরে ভক্তদের নিয়ে সংকীর্তন করতে করতে সিংহদ্বারে এসে, আঁচল পেতে বললেন পসারিদের—

হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে॥

শুরু হ'য়ে গেল মহোৎসব। সকল ভক্তদেরই প্রভু নিজ হাতে মালাচন্দন পরালেন, করালেন আকণ্ঠ ভোজন। আর, হরিদাসের কথাতে বললেন শেষপর্যন্ত আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে—

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হৈলা মেদিনী॥

এই প্রসঙ্গে আগেও একবার উল্লিখিত হয়েছে এবং এখানে এসেও মনে পড়ছে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই যুগান্তকারী ঘোষণাটি—'যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীনছার। কৃষ্ণভজনে নাহি কুলাদি বিচার॥' তবে, তত্ত্বতঃ কোন কিছু মেনে নেওয়া আর কার্যতঃ সেটিকে জীবনে প্রতিফলিত করার মধ্যে তফাৎ যে অনেকটাই। তাই বুঝি ধর্মের আর এক নাম কর্ম! এই যে হরিদাস ঠাকুর, যাঁকে নিয়ে মহাপ্রভুর এত কথা-এত কাণ্ড, লোকসমাজে এঁরই নাম ছিল 'যবন-হরিদাস'। আর সেই অপবাদে কি হিন্দু, কি মুসলমান উভয় সমাজেই ছিলেন তিনি প্রায় অস্পৃশ্য! অথচ মহাপ্রভু বা তাঁর শিষ্যদের কাছে তিনি যে কী ছিলেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অবলম্বনে এই প্রসঙ্গে এবং অন্যত্রও তারই কিছু-কিছু আভাস দেওয়ার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি মাত্র। শুনা যায়, মহাপ্রভুকে সামনে রেখে হরিদাসকে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করতে দেখে অনেকেরই সেদিন মনে এসে গিয়েছিল পিতামহ ভীষ্মের স্বেচ্ছামৃত্যুর ছবিটি। অনুরূপভাবে তাঁর 'পরমপাবন' মৃতদেহটি নিয়ে স্বয়ং মহাপ্রভুর প্রেমাবেশে যে-নৃত্য, তা স্মরণ করেও কি মনে ভেসে ওঠেনা সতীদেহ-স্কন্ধে আত্মভোলা শিবের তাণ্ডবনৃত্যের দৃশ্যটি? এছাড়াও বলতে হয়—কেবল আত্মজ্ঞানে বা তত্ত্বজ্ঞানেই নয়, ভক্তির পরাকাষ্ঠাতে যে এতো আদরের দেহটিকেও তুচ্ছজ্ঞান করা যায়, 'ভীষণং ভীষণানাম্' যে-মৃত্যু, তাকেও স্বেচ্ছায়-হেলায়-আনন্দে-নির্ভয়ে বরণ করে নেওয়া যায়—পরমভক্ত হরিদাসের কাহিনীটি কি তারও এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়?

শ্রীরূপ প্রসঙ্গে

(১)

নবাব হুসেন শা'র দুই প্রধান-আমাত্য—দবীরখাস ও সাকরমল্লিকের মনে জ্বলে উঠেছে বৈরাগ্যের আগুন! সাকরমল্লিক ওরফে সনাতনের কথা আগেই আলোচনা করা হ'য়েছে। এবারে বিশেষ করে দবীরখাস বা শ্রীরূপের কথা। মনের ভাব জানিয়ে বারেবারেই গোপনে চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন দু'ভাই মহাপ্রভুর কাছে। উত্তরে একবার লিখে পাঠালেন প্রভু বশিষ্টরামায়ণের শ্লোক একটি—'পরব্যসনিনীনারী ব্যগ্রাপিগৃহকর্ম্মসু। তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্॥' দেখ, পরপুরুষে-আসক্ত রমণী গৃহকর্মে নিযুক্ত থেকেও কেমন মনে-মনে সর্বক্ষণই উপপতির সঙ্গভোগ ক'রে থাকে! প্রভুর কথায় দু'জনেই তাঁর ইঙ্গিত মতোই কাজকর্ম ক'রে যেতে থাকেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরে অথবা প্রভুর দিকে মন রেখে, যতটা পারেন ক'রে যেতে থাকেন নবাবের প্রতি তাঁদের যে-কর্তব্য। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ বুঝি আর মানা মানেনা, বিশেষ ক'রে দবীরের! এমন এক সময়েই, হঠাৎ একদিন বৃন্দাবন যাবার নাম ক'রে, এসে উপস্থিত হ'য়েছিলেন মহাপ্রভু রামকেলিতে। আর এইখানেই দুপুররাত্রিতে লুকিয়ে এসে দেখা করেছিলেন দুভাই প্রভুর সাথে ও আনন্দে বিহ্বল হয়ে মনের খেদে কাঁদতে-কাঁদতে বলেছিলেন তাঁকে—

নীচজাতি, নীচসঙ্গী করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥

সবকথা শুনে ব'লেছিলেন সেদিন প্রভুও দবীরের দিকে চেয়ে—

তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস।

*　　*　　*

আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ-সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥

*　　*　　*

গৌড় নিকটে আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন।
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন॥

এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে।
সবে বলে 'কেন আইলা রামকেলি গ্রামে ॥'

মহাপ্রভুর এই 'মনের কথায়' মনে প'ড়ে যায় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকের একটি কথাও—'সাগর লঙ্ঘিয়া পরস্পর পরস্পরে করে দেখা। প্রাণ বোঝে কোথা তার টান। এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর'!

যাহোক, হঠাৎ সেদিন এইভাবে রামকেলিতে মহাপ্রভুর দর্শনলাভের ফলে রূপ-সনাতনের বৈরাগ্যের আগুনে যেন ঘৃতাহুতি প'ড়েছিল! কবে, কী করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে মিলিত হ'তে পারবেন প্রভুর সাথে—এই-ই এখন হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান! বিশেষ ক'রে, পেরে উঠছিলেন না রূপ আর বেশীদিন ধৈর্য ধরে থাকতে! তাড়াতাড়ি করে, টাকাপয়সা-বিষয়-সম্পত্তির কোনরকম একটা ব্যবস্থা করে ফেলে, অপেক্ষা করতে লাগলেন তিনি এখন খবরের আশায়—কখন যাবেন প্রভু নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে। খবর পেয়েই, সনাতনকেও যতশীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত হ'য়ে পড়তে অনুরোধ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রূপ ছোটভাই বল্লভকে সঙ্গে নিয়ে মহাপ্রভুর চরণোদ্দেশে। বৃন্দাবন থেকে ফেরার পথে এসে পৌঁছেছেন প্রভু প্রয়াগে। এখানেই একদিন দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণের ঘরে দেখা হল তাঁর রূপ ও বল্লভের সাথে। দেখা হওয়া মাত্রই—

দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া।
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥

মহাখুশি হয়ে বললেন প্রভু শ্রীরূপকে—ওঠো রূপ, ওঠো!

কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন।
বিষয়কূপ হৈতে তোমা কাড়িল দুইজন ॥

প্রেমাবিষ্ট হ'য়ে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন দু'ভাই—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

—হে দাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠদাতা—কৃষ্ণপ্রেমদাতা কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী গৌরকান্তি কৃষ্ণ! তোমায় নমস্কার! তোমায় নমস্কার!

এরপর সনাতনের কথায় বললেন রূপ প্রভুকে—রয়েছেন তিনি রাজবন্দী হয়ে। তুমি উদ্ধার করলে, তবেই তিনি উদ্ধার পাবেন। রূপের কথার উত্তরে—

প্রভু কহে 'সনাতনের হইয়াছে মোচন।
অচিরাতে আমাসহ হৈবে মিলন' ॥

কথা শেষে প্রসাদ পেয়ে সেদিনের মতো এখানেই রয়ে গেলেন দু'ভাই। এদিকে, মহাপ্রভু এসেছেন শুনে আম্বুলীগ্রাম থেকে পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট একদিন তাঁর সাথে দেখা করতে এসে উপস্থিত। পণ্ডিতকে দেখে, প্রণাম ও আলিঙ্গনাদির পরে, কৃষ্ণকথায় উদ্বেলিত নিজ হৃদয়ের ভাব অতিকষ্টে সংবরণ করে নিয়ে, তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রভু রূপ ও বল্লভের সাথে। পরিচয় পাওয়া মাত্রই—

দূর হইতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া।
ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা॥

কাজেই এবারে ভট্টকেও যথারীতি তাঁদের আলিঙ্গন করতে এগিয়ে আসতেই হ'ল। কিন্তু না, দু' ভাই-ই দূরে সরে গেলেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই বলে উঠলেন রূপ—

'অস্পৃশ্য পামর মুঁই না ছুঁইও মোরে'।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, রূপ ও বল্লভের এরূপ আচরণে বিস্মিত ভট্টকে বাধা দিয়ে নিজে প্রভুকেও সেই একই সঙ্গে বলে উঠতে শুনা যায়—

ইহোঁ না স্পর্শিও ইহোঁ জাতি অতিহীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥

অর্থাৎ কিনা, যাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি নিজে অপার আনন্দ পেতেন, সেই তাঁদিকেই 'হীনজাতি' বলে স্পর্শ করতেও নিষেধ করা হচ্ছে 'বৈদিক-যাজ্ঞিক-কুলীন এবং প্রবীণ' পণ্ডিত ভট্টকে! কেন যে এরূপ করা হয়েছিল, তার উত্তর অবশ্য পাওয়া যায় পরে একদিন অন্ত্যলীলায় জগন্নাথ ক্ষেত্রে, যেদিন অপূর্ব কৌশলে ভট্টের মন থেকে করেছিলেন প্রভু 'অভিমানপঙ্কক্ষালন'। দেখা যায়, শ্রীরূপ ও বল্লভের প্রতি ভট্টের আজকের এই যে আচরণ, এছিল নেহাৎ একটা বাহ্যিক সৌজন্যেরই ব্যাপার মাত্র, ছিলনা এর মূলে সত্যকার কোন আন্তরিক দৃঢ় শ্রদ্ধা, আর তার ফলেই প্রকারান্তরে মহাপ্রভুর এরূপ নিষেধাজ্ঞা।

এবারে এই প্রয়াগে বসেই আরম্ভ করা হতে দেখা যায় শ্রীরূপের শিক্ষাদান।

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্বপ্রান্ত।
সব শিখাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত॥
রামানন্দ পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল।
রূপে কৃপাকরি তাহা সব সঞ্চারিল॥
শ্রীরূপহৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিলা॥

দেখা যায়, শুধুমাত্র শাস্ত্রসিদ্ধান্ত— শাস্ত্রকথা শুনিয়েই ক্ষান্ত না হ'য়ে, দিয়েছিলেন

প্রভু শ্রীরূপকে সে-সব ধারণা করার মতো শক্তিও। এই শক্তি-সঞ্চারণেই বস্তুতঃ গুরুর গুরুত্ব! এছাড়া অন্য একটি কথাও এখানে বিশেষভাবেই লক্ষণীয়— 'রামানন্দপাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল'! তাঁর যে-সব উক্তি বা উপদেশ, তার মধ্যে অন্যের কাছ থেকে নেওয়া বা শেখা কোনকিছু থাকলে, কথাচ্ছলে সেই ব্যক্তির নামোল্লেখ করতে কখনও কার্পণ্য করতে দেখা যায়না মহাপ্রভুকে। এরই অন্যতর দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ্য শ্রীরামকৃষ্ণেরও অনুরূপ আচরণের কথা। অবশ্য 'অমানীমানদ' মহাপ্রভুর ন্যায় কোন কারও বেলায় কথাটা বলতে যাওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন থাকতো না, যদি কিনা লোকপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতি পদে-পদেই এর ব্যতিক্রম দেখতে না পাওয়া যেত!

যাহোক, একনাগাড়ে দশদিন ধ'রে চ'লেছিল এই শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ। বলতে-বলতে বললেন একদিন প্রভু - দেখ রূপ! এই ব্রহ্মাণ্ডে যে অসংখ্য জীবের বাস, তার মধ্যে মানুষের সংখ্যা তো নিতান্তই অল্প। এর মধ্যে আবার রয়েছে— ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ-বৌদ্ধ-শবর [যারা আদৌ বেদের ধার ধারে না]। [আর যারা বেদ মানে, এমন সব] -

বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে।
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত ॥

অন্যপ্রসঙ্গে এই কথাটিকেই বলতে শোনা যায়—'কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি অতীব দুর্লভ' ব'লেই। লক্ষণীয় শুধু শ্রীরূপকেই নয়, বলছেন এখানে প্রভু এইভাবে সারাজগতকেই, কেন তাকে এযুগে দিতে হ'য়েছিল ভক্তিমার্গের প্রাধান্য— রাগভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। তবে আনুষঙ্গিকভাবে একথাটাও বলতে হয় যে, যে- 'কোটীজ্ঞানী' বা 'কোটীমুক্তের' কথা এখানে বলা হয়েছে, তাঁদের যে অবস্থা ও গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' শ্লোকটিতে যে-পরম জ্ঞান ও চরম মুক্তির আভাস দেওয়া হয়েছে, তা কিন্তু এক পর্যায়ের নয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীকে পরাভক্তিরও অধিকারী ব'লে বলা হয়েছে[১]। শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেও

(১) লক্ষণীয়—জ্ঞানসংস্পৃষ্ট হওয়ায় এরূপ পরাভক্তিকেও চৈতন্যচরিতামৃতকারকে রায় রামানন্দ সংবাদে 'বাহ্য' ব'লেই অভিহিত করতে দেখা যায়।

—'পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণভক্তি অভেদ'। যাহোক, এই দুর্লভ কৃষ্ণভক্তি লাভ করতে গিয়ে স্বয়ং রূপ-সনাতনকেও সেদিনের সেই বৃন্দাবনে যে কী কঠোর সাধন-ভজন করতে হ'য়েছিল সাধকমাত্রকেই সে-কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে, বলতে শোনা যায় শ্রীচৈতন্য-চরিতকারকে মধ্যলীলা—১৯ পরিচ্ছেদে—

অনিকেত দোঁহে রহে, যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায়, ভোগ পরিহরি॥
করোয়ামাত্র হাতে কাঁথাছিড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণনাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে।
নামকীর্ত্তনপ্রেমে সেহো নহে কোনদিনে।
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্যচিন্তন॥

এইভাবে ভক্তিপ্রসঙ্গে একে-একে মধুরভাব অবধি পঞ্চভাবের কথা ও সেই সাথে আরও অনেক কিছু বলার পরে, বললেন প্রভু শ্রীরূপকে—

এই ভক্তিরসের কৈল দিগদরশন।
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন॥
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরাবে অন্তরে।
কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধুপারে॥

শিক্ষাশেষে জানালেন প্রভু রূপকে পরের দিনই তাঁর নীলাচলে ফেরার পথে বারাণসী রওনা হয়ে যাবার কথাটা। থাকতে চাইলেন রূপ তাঁর সাথে-সাথেই, কিন্তু তাতে বাধা দিয়ে বললেন প্রভু তাঁকে তখনকার মতো বৃন্দাবনে চলে যেতে ও তারপর যথাসময়ে গৌড় হয়ে নীলাচল গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হতে।

(৩)

কিছুদিন বৃন্দাবনবাসের পরেই, রওনা হ'য়ে পড়লেন রূপ গৌড়ের পথে নীলচলে গিয়ে শ্রীপ্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার আশায়। বৃন্দাবনে থাকতে-থাকতেই শুরু করা হয়েছিল যে-কৃষ্ণলীলা নাটকটির, তারই কথা ভাবতে-ভাবতে এসে পৌছিলেন তিনি একদিন গৌড়ে ছোটভাই বল্লভের সাথে। এখানেই হঠাৎ একদিন-

বল্লভের মৃত্যু ঘটার পরে, আবার যাত্রা শুরু ক'রে উড়িষ্যায় সত্যভামাপুরে এসে পৌছে, স্বপ্নে সত্যভামার আদেশ পেলেন রূপ -ব্রজপুরী ও মথুরাপুরীর ব্যাপার নিয়ে করা চলবে না একসঙ্গে নাটক রচনা। করতে হবে আলাদা-আলাদা নাটক[২]। কাজেই, মনে-মনে এখন সেই চিন্তাই করতে করতে অবশেষে একদিন এসে পৌছে গেলেন তিনি জগন্নাথক্ষেত্রে, হরিদাস ঠাকুরের আস্তানায়। এখানেই পরদিন মহাপ্রভুর সাথে দেখা হতেই, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে জানালেন তাঁকে রূপ সনাতনের ভিন্নপথে বৃন্দাবন যাওয়ার কথাটা (যা তিনি লোকমুখে শুনে এসেছিলেন) এবং সেইসঙ্গে বল্লভের মৃত্যু সংবাদটিও। এরপর অন্য একদিন প্রভুও রূপের পরিচয় করিয়ে দিলেন গৌড়ীয় ভক্তদের সাথে যারা-সব এবারে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছিলেন রথযাত্রা উপলক্ষ্যে।

অদ্বৈত নিত্যানন্দ প্রভু দুইজনে।
প্রভু কহে 'রূপে কৃপা কর দুইজনে॥
তোমা দোঁহার কৃপায় ইহার তৈছে হৌক শক্তি।
যাতে বিবরিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি'॥

বস্তুতঃ এই কৃষ্ণরসভক্তি রচনাই ছিল শ্রীরূপের বৈশিষ্ট্য। আর দেখাও যায় প্রথম থেকেই বিলক্ষণ জানতেন প্রভু, কে কি-কাজের যোগ্য। তাই প্রয়াগে রূপকে তিনি যে-সব উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে রসতত্ত্বের কথাই ছিল বেশী; অন্যপক্ষে, বারাণসীতে সনাতনকে দেওয়া তত্ত্বোপদেশের মধ্যে, রসতত্ত্বের চেয়ে অন্য সব তত্ত্ব ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তের কথাই বলা হ'য়েছিল বেশী-বেশী করে। যাহোক. পরে একদিন বিস্মিত হয়েছিলেন রূপ মহাপ্রভুর মুখেও সেই একই কথা শুনতে পেয়ে, যা তাকে আগেই সত্যভামা স্বপ্নে বলে দিয়েছিলেন। কাজেই আরম্ভ করতেই হ'ল এবারে পৃথক-পৃথক নাটকরচনা।

এরপর, রথযাত্রার দিনে, অন্য সকলের সাথে করলেন রূপও জগন্নাথ-দর্শন ও সেই সাথে 'যঃ কৌমারহরঃ' প্রভৃতি শ্লোক পাঠ ও কীর্তন করতে-করতে মহাপ্রভুর যে

২। বস্তুতঃ এইভাবে কেবল পৃথক নাটক রচনাই নয়, এই সূত্রে ইঙ্গিতে দেওয়া হয়েছে সাধ্য-সাধন তত্ত্বেরও। প্রকারান্তরে বলা হয়েছে, ঐশ্বর্যজ্ঞান এমনকি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও 'বাহ্য-জ্ঞানে' বর্জন ক'রে, জ্ঞানশূন্যাভক্তি—রাগভক্তি বা রাগানুগাভক্তি সাধনারই কথা। 'গোপীঅনুগত বিনা, ঐশ্বর্যজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥' মধ্যলীলা: রায় রামানন্দ-সংবাদ। অবশ্য একথাটাও সত্য,—সাধ্য যেখানে 'ব্রজেন্দ্রনন্দন', সাধনপদ্ধতিও সেখানে সেইরূপই হওয়ারই কথা।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্'। গীতা ৪।১১

নৃত্য, তাও দেখা হল সকলের সাথে। শ্লোকটির আসল অর্থটা যে কী, তা জানতেন কেবল প্রভু নিজে ও স্বরূপ গোঁসাই। এবারে এটির ভাবার্থটা নিয়ে গোপনে-গোপনে লিখে ফেললেন রূপ অনুরূপ একটি শ্লোক। একদিন শ্লোকটিকে কুটিরের চালের বাতায় গুঁজে রেখে গিয়েছেন রূপ সমুদ্রস্নানে, এমন সময় হঠাৎ মহাপ্রভু এসে উপস্থিত। চালের বাতায় তালপাতায় লেখা কি একটা গোঁজা রয়েছে দেখে, সেটিকে টেনে নিয়ে একটু প'ড়ে দেখতেই তিনি তো অবাক। একী! কেমন ক'রে জান্‌ল রূপ আমার অন্তরের কথাটা! এদিকে স্নান সেরে ফিরে এসে প্রভুকে দেখামাত্রই দণ্ডবৎ হ'য়ে পড়লেন রূপ তাঁর পায়ে। প্রভুও কিন্তু আজ তাঁকে দণ্ড না দিয়ে ছাড়লেন না!

প্রভু তারে চাপড় মারি লাগিল কহিতে।
'গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমতে?'

বলতে-বলতে করা হ'ল রূপকে দৃঢ় আলিঙ্গনও, ও তারপর—

সে-শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল।
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল॥

সেই একই প্রশ্ন—কী ক'রে জান্‌ল রূপ আমার মনের কথাটি? এই 'পরীক্ষা' বা প্রশ্ন থেকেই বুঝা যায়, জান্‌তেন না তখনও স্বরূপ গোসাঁই প্রয়াগে মহাপ্রভুর শ্রীরূপকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটা। কিন্তু স্বরূপ তো ছিলেন তাঁরই দ্বিতীয় রূপ! কাজেই রূপের শ্লোকটি দেখামাত্রই তাঁর পক্ষে কিছুই আর বুঝতে বাকী রইল না! আর তাই তাকে এখন বল্‌তেও শুনা যায়—জানি আমি প্রভু, এ তোমারই কীর্তি—তোমারই কৃপার নিদর্শন!

অন্যথা এ অর্থ কারও নাহি হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান॥

স্বরূপের কথায়, মৃদু হেসে প্রকাশ ক'রে ফেলতেই হল প্রভুকে ব্যাপারটা!

প্রভু কহে 'ইহোঁ আমায় প্রয়াগে মিলিলা।
যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা হৈলা॥
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ।
তুমিও কহিও ইহায় রসের বিশেষ॥'

এমনি ক'রেই চলতে থাকে শ্রীপ্রভুর রসলীলা—রূপ, স্বরূপ, রায় রামানন্দ ও আর-আর রসিক ভক্তদের নিয়ে। এদিকে লিখে চ'লেছেন রূপও আলাদা-আলাদা ক'রে দুটি নাটক—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব। কখনও স্বয়ং রূপকে দিয়েই,

কথনও-বা স্বরূপ গোসাঁইকে দিয়ে পড়িয়ে-পড়িয়ে শোনান প্রভু, রায় রামানন্দ, সার্বভৌম ও অন্যান্য ভক্তদের রূপের নাটকের এক-একটি শ্লোক, আর তা শুনতে-শুনতে রসের পারিপাট্য দেখে, সকলেই হ'য়ে পড়েন আনন্দে আত্মহারা! এইভাবেই একদিন 'বিদগ্ধমাধবের' দ্বিতীয় নান্দীশ্লোকটিতে তাঁর নিজের বন্দনা শুনতে পেয়ে, ভৎর্সনার সুরে ব'লে ওঠেন প্রভু রূপকে—একী ক'রেছ!

'কাঁহা তোমার কৃষ্ণরসকাব্য-সুধাসিন্ধু!
তার মধ্যে কেন মিথ্যাস্তুতি ক্ষারবিন্দু?'

নিরুত্তর রূপের বদলে, উত্তর দেন রায়-রামানন্দ—না, না প্রভু, ক্ষারবিন্দু কেন?

'রূপের বাক্য অমৃতের পুর।
তারমধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥'

[বটে!]

প্রভু কহে 'রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস!
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস॥'

আর যাঁর যেমনই হোক, বিদগ্ধ ভক্ত রামানন্দের ভাব ছিল কিন্তু একটু আলাদা!

রায় কহে 'লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে'॥

কেন প্রভু! রূপতো ঠিকই করেছে! মঙ্গলাচরণে অভীষ্টের স্মরণই তো রীতি। এরপর আরও সব শুনে, শতমুখে রূপের কবিত্বের প্রশংসা ক'রে বলতে লাগলেন রায়-রামানন্দ প্রভুকে—

'কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার।
নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার॥'

* * *

'মোর মুখে যে-সব রস করিলে প্রচারণে।
সেই রস দেখি এই ইহার লিখনে॥'

লক্ষ্য করার কথা, বলছেন এখানে রামানন্দ—'মোর মুখে যে-সব রস করিলে প্রচারণে'। যে ঠিক্-ঠিক্ ভক্ত, সে জানে—অনুভব করে, স্বয়ং ঈশ্বরই কচ্ছেন যাকিছু গৌরব-অগৌরবের, তাকে নিমিত্তমাত্র ক'রে! যাহোক, এরপর নিজে প্রভুও এবারে রূপকে লক্ষ্য ক'রে তাঁদের দু'ভাই-এর কথায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠে, বলতে লাগলেন সকলকে—

সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর।
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর॥
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম॥
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তাঁর রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি॥

তারপর কথাশেষে—

তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন।
তাঁহারে করাইল সবার চরণবন্দন॥

শিষ্যব্যবহারের কী অপূর্ব রীতিই-না ছিল মহাপ্রভুর! এই রূপ-সনাতনের কথাতেই, ব'লেছিলেন তিনি আগে একদিন সনাতনকে বারাণসীতে—'তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে', আবার আজও বলছেন এখানে তাঁর সম্বন্ধে—'পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম', অথচ কতবার যে করিয়েছেন তিনি সেই তাঁকে দিয়েই সকল ভক্তদের চরণবন্দনা,—কতবার যে নিজেও আকুলভাবে সকলের কাছে মেগেছেন তাঁর জন্য আশীর্বাদ, নেই তার কোন ঠিক-ঠিকানা! এই একই কথাই বলতে হয়—রূপ, হরিদাস ও আরও সব বিশিষ্ট ভক্তদের সম্বন্ধেও, যাঁদের গ'ড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি বৈষ্ণব সমাজের নেতা ক'রে।

প্রভু ও ভক্তদের সাথে এমনি ক'রেই মনের আনন্দে কেটে যেতে থাকে শ্রীরূপের নীলাচলবাসের দিনগুলো। চারমাস পরে দেশে ফিরে গেলেন গৌড়ের ভক্তেরা। রয়ে গেলেন রূপ দোলযাত্রা পর্যন্ত। পরে তাঁকেও একদিন সস্নেহে বললেন প্রভু—

বৃন্দাবনে যাও তুমি, রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইঁহ পাঠাইও সনাতনে॥
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
তীর্থ সব লুপ্ত তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণসেবারসভক্তি করিও প্রচার।
আমিও দেখিতে তাঁহা যাব একবার॥

শ্রীরূপ বৃন্দাবনে চ'লে যাবার পরে, অন্তলীলার শেষকাণ্ডে শুরু হ'য়েছিল মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা। কাজেই, প্রকটলীলায় তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি বৃন্দাবন যাওয়া। এইসব কথা মনে করেই কি তাই আর্তি করে বলতে শুনা

যায় শ্রীরূপকে তাঁর 'স্তবমালায়'— আহা! যিনি কখন-কখন সমুদ্রতীরে উপবনশ্রেণী দেখেই বৃন্দাবন ভেবে মুহুর্মুহুঃ প্রেমে অধীর হ'য়ে পড়তেন,—যাঁর রসনা নিরন্তরই কৃষ্ণনামোচ্চারণে রত থাকতো, সেই পরমপ্রেমিক শ্রীচৈতন্যকে কি আমি আর কখনও আমার এই চোখ দুটি দিয়ে দেখতে পারবো ![৩]

(৩) স্তবমালা—শ্রীরূপ গোস্বামী—'পয়োরাশেস্তীরে' শ্লোকটির ভাবানুবাদ।

রঘুনাথ দাস প্রসঙ্গে

(১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথায়—

চৈতন্যচরিত এই ইক্ষুদণ্ডসম।
চর্ব্বণ করিলে হয় রস-আস্বাদন॥

এই ইক্ষুরস আস্বাদনের লোভেই, শ্রীরূপ-সনাতন ও হরিদাস ঠাকুরের কথার পরে, এবারে ছয় গোস্বামীর অন্যতম দাস-রঘুনাথের জীবনে প্রথম থেকেই মহাপ্রভুর যে-সংস্পর্শ ঘটেছিল, তা নিয়ে কিছু-একটু আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। এঁরই সঙ্গ ও আনুকূল্যের ফলেই যে সম্ভব হ'য়েছিল শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী মশায়ের পক্ষে চৈতন্যচরিতামৃতের মতো গ্রন্থখানি রচনা করা, তারই স্বীকৃতি হিসেবেই বোধহয় গ্রন্থখানির প্রতি পরিচ্ছেদের শেষেই একবার ক'রে বলা হয়েছে—

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য আদিলীলা ৯ম পরিচ্ছেদের উক্তিটিও "সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার।"

এরপর, রঘুনাথের পিতৃপরিচয় দিতে গিয়ে বলতে শুনা যায় চরিতকারকে—

হিরণ্যগোবর্দ্ধন দাস দুই সহোদর।
সপ্তগ্রামে বারলক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রাহ্মণ্য।
সদাচার সৎকুলীন ধার্মিক-অগ্রগণ্য॥

*　　*　　*

সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথ দাস।
বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস॥

পরে, মহাপ্রভুর সাথে প্রথম পরিচয়ের কথায় বলা হ'য়েছে—

সন্ন্যাস করি যবে শান্তিপুরে আইলা।
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা॥

শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য ছিলেন রঘুনাথের পিতার পরম শ্রদ্ধার পাত্র, কাজেই

শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহেই ঘটেছিল এই মিলন। দেখা হওয়ার পাঁচ-সাত দিন পরেই রঘুনাথকে বিদায় দিয়ে চ'লে গেলেন প্রভু নীলাচলে। এদিকে বাড়ী ফিরে এসে রঘুনাথ তাঁর প্রেমে হ'য়ে পড়েছেন পাগল !

বারবার পালায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে।
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখেন আনি পথ হৈতে ॥

পাঁচজন পাইক, চারজন সেবক, আর দু'জন ব্রাহ্মণের উপরে দেওয়া হয়েছে তার দেখাশুনোর ভার।

এই একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর।
নীলাচলে যাইতে না পায়, দুঃখিত অন্তর ॥

এইভাবে যৌবনের প্রারম্ভেই পিতৃগৃহে বন্দী হ'য়ে কাটতে থাকে রঘুনাথের দিন।

(২)

এর বেশ কিছুদিন পরে, যখন নীলাচল থেকে গৌড় হ'য়ে বৃন্দাবন যাবার পথে কানাই-নাটশালা পর্যন্ত গিয়েই 'লোক-সংঘট' ভয়ে ফিরে এসেছিলেন মহাপ্রভু শান্তিপুরে তখন খবর পেয়ে ধ'রে বসলেন রঘুনাথ পিতাকে --

আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ।
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন ॥

ছেলের অবস্থা দেখে বাধ্য হ'য়েই সম্মতি দিতে হল পিতাকে। অনেক লোকজন ও জিনিসপত্তর সঙ্গে দিয়ে বললেন তিনি রঘুনাথকে তাড়াতাড়ি করে ফিরে আসতে। শান্তিপুর পৌঁছে, সাতদিন ধরে রঘুনাথ মহাপ্রভুর সঙ্গ করলেন। কিন্তু অহরহ তাঁর মনে উঠতে থাকে—

রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব।
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ॥

মনের কথা মুখে কিছু না বললেও, বুঝতে বাকী থাকে না প্রভুর। তাই সেকথা বুঝে নিয়ে একদিন বেশ একটু কড়া সুরেই বল্‌তে শুনা যায় তাঁকে নব অনুরাগী যুবক রঘুনাথকে—

স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে-ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥
মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।

যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তর নিষ্ঠাকর, বাহে লোকব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার ॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমাপাশ আসিও কোন ছলে ॥

মুখ ফুটে হঠাৎ কিছু বলাটা রঘুনাথের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু মহাপ্রভুর কথা শুনে হয়তো তাঁর মনে এসে গিয়েছিল : হায়! হায়! এই বন্দিদশায় থেকে কি ক'রে আমি সে-ছলের সন্ধান পাব? আর তাই-ই বুঝি পরক্ষণেই ব'লে উঠতে শুনা যায় প্রভুকে পরম আশ্বাসের স্বরে—

সে-ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণকৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে!

তুলনামূলকভাবে দেখা যায়, বস্তুতঃ আজকের এই সব কথাই ব'লেছিলেন প্রভু অন্য একদিন বয়সে প্রবীণ, বুদ্ধিতে নিপুণ, সংসারী ভক্ত রূপ-সনাতনকেও, 'পরব্যসনিনী নারীর' উপমা দিয়ে। তফাতের মধ্যে এবারে, রঘুনাথের বয়স ও মানসিক অবস্থা বিবেচনা ক'রেই বোধহয় বাদ দিতে দেখা যায় তাঁকে সেই পরব্যসনিনী নারী অর্থাৎ 'নষ্টস্ত্রী'র উপমাটি। যাহোক, রূপ সনাতন ও সেই সঙ্গে রঘুনাথ দাসের প্রতিও মহাপ্রভুর এই-যে এরূপ নির্দেশ, এ দেখে মনে এসে যায় ভাগবতের সেই বিখ্যাত শ্লোকটিও, যা একদিন স্বয়ং কৃষ্ণই বলেছিলেন উদ্ধবকে—'তাবৎ কর্ম্মানি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥' অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত নির্বেদ [তীব্র বৈরাগ্য] উপস্থিত না হয়, অথবা ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে [গভীর] শ্রদ্ধা না জন্মে, ততদিন পর্যন্ত [শাস্ত্রনির্দিষ্ট] কর্ম করে যাওয়াই বিধেয়। অন্যকথায়, বিষয়ে সত্যকার বৈরাগ্য বা ঈশ্বরে প্রগাঢ় অনুরাগ না জন্মান পর্যন্ত, হওয়া যায় না কর্মত্যাগের অধিকারী।[১] এরূপ কর্মত্যাগের সত্ত-অধিকারী হিসেবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, পরম বৈরাগ্যবান, ঈশ্বরপ্রেমিক ও বিষয়সংস্কারমুক্ত অভিজ্ঞ ভক্ত হরিদাসের দৃষ্টান্তটি, যে-ক্ষেত্রে দেখা যায় না মহাপ্রভুকে আদৌ কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করতে, বরং প্রথম দর্শনের দিন থেকেই দিতে দেখা যায় তাঁকে কর্মত্যাগের অবাধ অধিকার। অবশ্য রঘুনাথের সম্বন্ধেও একথা সত্য যে, যদিবা তাঁর অন্তরের অন্তরে তখন পর্যন্তও কোথায়ও কোন বিষয়ের সংস্কার বা বিষয়বাসনা প্রসুপ্ত রয়ে গিয়েছিল, নিজের বৈরাগ্য ও মহাপ্রভুর

(১) শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—কাটা দিয়ে কাটা তুলে তারপর দু'টো কাঁটাই ফেলে দাও।

প্রতি প্রবল অনুরাগের গুণে, সে-সবও কাটিয়ে উঠতে তাঁর পক্ষে বড় বেশী দেরী হয়নি। বস্তুতঃ যেমন দেখাও যায়, আগে থাকতেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, দ্বিতীয় দর্শনের সময়েই সেইভাবে রঘুনাথকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেনও প্রভু—
'অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন উদ্ধার।'

যাহোক, প্রভুর আদেশ শিরোধার্য করে ঘরে ফিরে এলেন রঘুনাথও তারপর—

বাহ্যবৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥
দেখি তার পিতামাতা বড় তুষ্ট হৈল।
তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল॥

এইভাবে বাইরের আবরণ কিছু শিথিল করা হল বটে, কিন্তু অন্যদিকে এই সুযোগে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ের সাথে রঘুনাথের বিয়ে দিয়ে ফেলে, তাঁর সংসার-বন্ধনকে আরও শক্ত করে তুলতেও চেষ্টার কসুর করলেন না রঘুনাথের বাপ-মা। যাহোক, এমনি করেই এক বছর ধরে মহাপ্রভুর আদেশে অন্তরের বৈরাগ্য গোপন রেখেই ক'রে গেলেন রঘুনাথ পিতামাতা ও সংসারের যথাসাধ্য সেবা। কিন্তু আর বুঝি ধৈর্য্যে কুলিয়ে ওঠেনা! রাত্রিতে উঠে এক-একদিন বাপ-মা, স্ত্রী, ঘরসংসার সব ছেড়েই পালিয়ে যান রঘুনাথ। কিন্তু আবার চারদিকে লোকজন পাঠিয়ে খোঁজখবর ক'রে ধ'রে-ধ'রে আনেন তাকে পিতা গোবর্দ্ধন। নিরুপায় হ'য়ে অগত্যা স্বামীকে ব'লে বসেন একদিন রঘুনাথের মা—'পুত্র বাতুল হৈল, রাখহ বান্ধিয়া'। দুঃখের ম্লান হাসি হেসে, উত্তর দেন রঘুনাথের পিতা—

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বান্ধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে?
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥

কাজেই দেখা যায়, এতদিনে মনে-মনে বেশ বুঝে নিয়েছিলেন রঘুনাথের বাপ-মা,—যাবে না আর বেশী দিন ছেলেকে সংসারে ধ'রে রাখা!

এমনি যখন চলেছে বাড়ার অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন নিত্যানন্দ প্রভুর আসার খবর পেয়ে কোনরকমে পানিহাটি গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলেন রঘুনাথ। স্বাভাবিক রসিকতা ও আদরের সাথে রঘুনাথকে গ্রহণ ক'রে করলেন নিত্যানন্দ তাঁর জন্য এক অভিনব দণ্ডের ব্যবস্থা! মহাসমারোহে করা হ'ল একদিন এই দণ্ডমহোৎসব—অর্থাৎ কিনা চলতি কথায় যাকে বলা হয়ে থাকে 'চিড়ের

মহোৎসব'। উৎসবশেষে বাড়ী ফিরে যাওয়ার সময় আশীর্বাদ ক'রে বললেন নিত্যানন্দ, মহাপ্রভুর সাথে মিলনের আশায় ব্যাকুল রঘুনাথকে –

নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ ।।

এইভাবে আশ্বস্ত হ'য়ে বাড়ী ফিরে এলেন বটে রঘুনাথ, কিন্তু—

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ।।

পাছে আবারও পালিয়ে যান এই ভয়ে, এখানেও রয়েছে রাত্রিদিন কড়া পাহারার ব্যবস্থা। কাজেই, সুযোগের অপেক্ষা ক'রে বসে থাকা ছাড়া কোন আর উপায় ছিল না। খবর এল একদিন – গৌড়ের ভক্তেরা দল বেঁধে মহাপ্রভুকে দেখতে চ'লেছেন। কিন্তু তাতে আ তাঁর লাভ কি? তাঁদের সাথে তো আর তাঁর যাওয়া চলে না। তা হলে যে ধরা পড়ে যেতে হবে নির্ঘাত! যা হোক, এর কদিন পরেই হঠাৎ জুটে গেল একটা সুযোগ —ফ'লে গেল মহাপ্রভুর আশ্বাসবাণী— 'সে-ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে। কৃষ্ণকৃপা যাবে, তারে কে রাখিতে পারে!' একটুকুও দেরী না ক'রে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন রঘুনাথ নীলাচলের পথে। তারপর, পাছে ধরা পড়ে যান এই ভয়ে—

গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে-বনে।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে ॥
পঞ্চদশ ক্রোশ চলিগেলা একদিনে।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা।
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা ॥

এই ভাবে চলতে চলতে—

বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিন দিন মাত্র করিল ভোজন ।।

(৩)

সকালবেলা। স্বরূপগোসাঁই ও আর-আর ভক্তদের নিয়ে নিজের ডেরায় বসে আছেন প্রভু। এমন সময় হঠাৎ রঘুনাথ এসে উপস্থিত।

অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত।
মুকুন্দদত্ত কহে 'এই আইল রঘুনাথ'॥

প্রণাম ও আলিঙ্গনাদির পরে (কল্পনার চোখ দিয়ে বেশ দেখতে পাওয়া যায়) মৃদু হেসে বলছেন প্রভু রঘুনাথকে—দেখলে তো রঘু! যা ব'লেছিলাম তাই-ই তো হ'ল। 'কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে। তোমারে কাড়িল বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে॥' এরপর সকলকে শুনিয়ে, 'সদাচার, সৎকুলীন' ও 'ধার্মিক-অগ্রগণ্য' ব'লে যাঁদের এত খ্যাতি, রঘুনাথের সেই বাপ-জেঠার কথাতে বলতে শুনা যায় তাঁকে রহস্য ক'রে—

ইহার যে বাপ-জেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, হয়ে বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব করে মহাঅন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥

একথা বলাই বাহুল্য যে, সকল ভক্তদের, বিশেষ করে যাঁরা রঘুনাথের মতো কায়মনোবাক্যে ত্যাগের পথ আশ্রয় করেছেন তাদের, বিষয়বিতৃষ্ণাকে দৃঢ়মূল ও বিষয়ীর সঙ্গ ত্যাগ করাবার উদ্দেশ্যেই রঘুনাথের বাপ-জেঠার সম্বন্ধে মহাপ্রভুর এই শ্লেষবাক্য। তবে সেই সঙ্গে এও বলতে হয়,—যে নিজে সত্যকার ত্যাগী, সম্পূর্ণ অন্যনিরপেক্ষ, তাঁর পক্ষে অন্যের মুখ চেয়ে, রেখে-ঢেকে কথা বলার প্র...জনটাই বা কী? যা হোক এরপর, পরমপণ্ডিত, সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত, 'কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা', 'মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ' এমন যে স্বরূপ-দামোদর, তাঁকেই দিলেন প্রভু বৈষ্ণব সমাজের ভাবী অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা, সংসারত্যাগী যুবক রঘুনাথের শিক্ষার ভার। অন্যদিকে সেই সঙ্গে আপন সেবক গোবিন্দকে ডেকে বলা হ'ল—

পথে ইঁহো করিয়াছেন বহুত লঙ্ঘন।
কতদিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ॥

এসবের পরে, চ'লে গেলেন রঘুনাথ প্রভুর কথামতো সমুদ্রস্নান ও জগন্নাথদর্শন ক'রে এসে, গোবিন্দের কাছে প্রসাদ পাবার জন্য।

এইভাবে মহাপ্রভুর আদেশে একদিন-দুদিন ক'রে পাঁচদিন গোবিন্দের কাছে প্রসাদ পাবার পরেই, ছ'দিনের দিন এসে দাঁড়ান রঘুনাথ জগন্নাথের সিংহদ্বারে, অন্য আর পাঁচজন নিষ্কিঞ্চন ভক্তের মতোই ভিক্ষা ক'রে খাওয়ার উদ্দেশ্যে। যান না

তিনি আর গোবিন্দের কাছে প্রসাদের জন্য। এদেখে একদিন—প্রভুকে গোবিন্দ কহে 'রঘুনাথ প্রসাদ না লয়। রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়॥' গোবিন্দের কথা শুনে প্রভু তো মহা খুশি! ঠিকই ক'চ্ছে রঘুনাথ—বৈরাগীর মতোই তো আচরণ কচ্ছে!

বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নামসংকীর্ত্তন।
মাগিয়া খাইয়া করে জীবনরক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ॥

লক্ষ্য করার কথা, বলছেন না প্রভু এখানে 'জীবনধারণ', বলছেন 'জীবনরক্ষণ'। অর্থাৎ কিনা কোনরকমে যতটুকুমাত্র প্রয়োজন ততটুকু খেয়েই বেঁচে থাকা, ঈশ্বরের নাম—ঈশ্বরের চিন্তা—ঈশ্বরের কাজ করবার জন্য!

যাহোক, প্রভুর কথামতো এইভাবে কোনরকমে ভিক্ষান্নে জীবনরক্ষণ ক'রেই কাটতে থাকে রঘুনাথের দিন স্বরূপগোসাঁই-এর আশ্রয়ে। মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ-ভাবে তাঁর কোন কথাই হয় না। যা কিছু বলবার, বলেন তিনি তা হয় গোবিন্দ, না-হয় স্বরূপ গোসাঁইয়ের মুখ দিয়েই। এইভাবেই একদিন রঘুনাথের হ'য়ে—

প্রভু-আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে।
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে॥
'কি মোর কর্ত্তব্য? মুঞি না জানে উদ্দেশ্য'।
আপনি শ্রীমুখে প্রভু করুন উপদেশ॥

কথা শুনে, মৃদু হেসে বললেন প্রভু রঘুনাথকে—কেন রঘু, স্বরূপ গোসাঁইকেই তো ক'রে দেওয়া হয়েছে তোমার উপদেষ্টা। ওঁর কাছ থেকেই তো তুমি যা কিছু সাধ্য-সাধনতত্ত্ব শিখে নিতে পার! তাছাড়া বলতে কি? এসব বিষয়ে ইনি যতটা জানেন, আমি নিজেও ততটা জানিনে। তবে যদি আমার কথাতেই তোমার বেশী শ্রদ্ধা হয়, তবে বলি শোন—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥
অমানীমানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণসেবা মানসে করিবে॥

নিতান্ত বিস্ময়ের কথা—রঘুনাথের মতো এমন তীব্র বৈরাগ্যবান, ঈশ্বরানুরাগী যুবককে আগেও একবার বলা হ'য়েছিল—'মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।

যথাযোগ্য বিষয়ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা ॥' এবং এখনও আবার সেই তাঁকে, রাজার ছেলে হ'য়েও স্বেচ্ছায় সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে চোখের সামনেই ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করতে দেখেও, বলা হচ্ছে কিনা—'ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে!' হয়তো-বা কথা হ'তে পারে—লোকশিক্ষার জন্যই তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে মহাপ্রভুকে এরূপ বলতে হ'য়েছিল। কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও বলতে হয়, যাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে লোকশিক্ষা, শিক্ষার লক্ষ্য থেকে তিনি নিজেও তো একেবারে বাদ যান না! কাজেই দেখে শুনে মনে হয়, এরূপ উচ্চকোটী সাধকেরও যেখানে যেটুকু গলদ থাকা সম্ভব তা একমাত্র মহাপ্রভুর ন্যায় সর্বান্তর্গামী, অন্তর্ভেদী-দৃষ্টিসম্পন্ন গুরুর-গুরুগণের পক্ষেই যথার্থভাবে জানা সম্ভবপর। অন্যপক্ষে, রঘুনাথের মতো শুদ্ধচিত্ত, বিবেকবৈরাগ্যসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্য ভিন্ন অন্যের পক্ষেও গুরুর এরূপ কঠোর আদেশ নির্বিচারে ও এতো আনন্দের সাথে যথাযথভাবে পালন করাও সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গীতায় ৪র্থ অধ্যায়ের 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥' শ্লোকটি। জ্ঞানলাভ (বা ভক্তিলাভের) জন্য শ্রদ্ধাবান হওয়া অবশ্য-প্রয়োজন। কিন্তু, কেবল শ্রদ্ধাবান হলেই চলেনা, হ'তে হয় সাধনতৎপর ও জিতেন্দ্রিয়ও। এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে-সঙ্গেই অথবা এর ফলস্বরূপই লাভ হ য়ে থাকে পরম শান্তিও। বলা বাহুল্য, রঘুনাথের জীবনে গীতার এই শ্লোকটি বর্ণে-বর্ণেই সত্য ব'লে প্রমাণিত হ'তে দেখা যায়।

যাহোক, কথাশেষে বললেন প্রভু রঘুনাথকে—

এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥

(৪)

কদিন পরেই এসে পৌছিলেন গৌড়ের ভক্তেরা, অদ্বৈতাচার্য ও শিবানন্দ সেনের সঙ্গে। সবাইকে নিয়ে করলেন প্রভু মহানন্দে গুণ্ডিচামার্জন, বনভোজন, রথাগ্রেনর্তন ও আরও সব কত কী! দেখেশুনে চমৎকৃত হলেন রঘুনাথ। সকলের সাথেই আবারও তাঁর নতুন ক'রে আলাপ-পরিচয় হ'ল। এ থেকে চার মাস পরে গৌড়ীয় ভক্তেরা দেশে ফিরে গেলে, পুত্রবিরহে কাতর রঘুনাথের বাপের কাছ থেকে যখন লোক এসে নিরুদ্দিষ্ট রঘুনাথের সন্ধান জানতে চেয়েছিল, তখন বিস্মিত শিবানন্দ শুধু যে তাদের ব'লেছিলেন—'তিঁহো হয় প্রভুস্থানে। পরম বিখ্যাত

তিহোঁ কেবা নাহি জানে ?'—তা নয়, সেইসঙ্গে তিনি আরও ব'লেছিলেন, কেমন ক'রে কঠোর সাধন-ভজন নিয়েই কাটছে রঘুনাথের দিন—কখনও অধাশনে, কখনও বা অনশনেই। নিজের লোকের মুখে সবকথা জানতে পেরে, রঘুনাথের বাপ-মার মনের অবস্থাটা সেদিন যে কী দাঁড়িয়েছিল, তা বোধ হয় আর না বলতে গেলেও চলে! স্ত্রীর কথার তো উল্লেখই নেই কোথায়ও। তাড়াতাড়ি ক'রে নগদ চারশো মুদ্রা, দু'জন চাকর ও একজন ব্রাহ্মণকে শিবানন্দ সেনের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে, ধ'রে বসলেন তাঁরা, মোটেই দেরী না ক'রে পাঠিয়ে দিতেই হবে সে-সকলকে নীলাচলে ছেলের কাছে। কিন্তু সেদিনের দেশকালের যে-অবস্থা, তাতে কোনরকমেই সম্ভব ছিলনা তাঁদের এ অনুরোধ রক্ষে করা। অগত্যা আরও প্রায় একবছর অপেক্ষা ক'রে, পরের বছর গৌড়ের ভক্তদের সাথে টাকা পয়সা নিয়ে এসে পৌঁছিল গোবর্দ্ধনের লোকেরা নীলাচলে। দেখা হ'ল সকলের রঘুনাথের সাথে। কিন্তু কোনমতেই রাজী হ'লেন না তিনি বাপের দেওয়া টাকাকড়ি গ্রহণ করতে। পরে অবশ্য অনেক ভেবেচিন্তে, এবং মহাপ্রভুকে মাসে দু'দিন নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে রাজী করিয়ে, ওর খরচপত্র বাবদ মাসে-মাসে মাত্র 'অষ্টপণ কৌড়ি' ক'রে নিতে সম্মত হ'য়েছিলেন রঘুনাথ। নিজে তিনি খান ভিক্ষে ক'রে, আর এইভাবে চলতে থাকে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ প্রায় বছর দুয়েক ধ'রে। এরপর হঠাৎ একদিন নিমন্ত্রণ বন্ধ হ'য়ে যাওয়ায়, সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু স্বরূপ গোসাঁইকে—আচ্ছা স্বরূপ, বলতে পার কি, রঘু কেন আর নিমন্ত্রণ করে না ? জানতেন স্বরূপ আগে থাকতেই রঘুনাথের মনের কথাটা। প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে সেই কথাটাকেই তাকে এখন খুলে বলতে শুনা যায় রঘুনাথের হ'য়ে—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ।
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন ॥
মোর চিত্ত দ্রব্য লইতে না হয় নির্ম্মল।
এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠামাত্র ফল ॥
উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ।
না মানিলে দুঃখী হইবে এই মূর্খজন ॥

স্বরূপের কথা শুনে, হাসতে হাসতে বললেন তাঁকে এবারে প্রভু নিজের অন্তরের কথাটাও—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥

ইহাঁর সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল।
ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল॥

কথা আছে, শুদ্ধ মন গুরুর কাজ করে। তাই বুঝি আগে থাকতেই রঘুনাথের শুদ্ধ মনের দর্পণে মহাপ্রভুর অন্তর্নিহিত ভাব এভাবেই প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায়। এছাড়াও বলতে হয়—এই যে এখানে মহাপ্রভুর কথাটি—'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন'—এটি যে কতদূর সত্য, কেবল পুরাণের কালেই নয়, কোন কালেই তার প্রমাণের কোন অভাব নেই। তবে যে সত্য-সত্যই 'কৃষ্ণের স্মরণে'র জন্য লালায়িত, কেবল তাঁর কাছেই কথাটির যা কিছু মূল্য !

যাহোক, এইভাবে কেবল প্রভুর নিমন্ত্রণ বন্ধ ক'রেই ক্ষান্ত না হ'য়ে, নিজেও এখন সিংহদ্বার ছেড়ে দিয়ে, দুপুর বেলা ছত্রে গিয়ে ভিক্ষে ক'রে যা কিছু পান, তা দিয়েই কোনরকমে দিন কাটাতে থাকেন রঘুনাথ। সিংহদ্বারে তাঁকে আর দাঁড়াতে না দেখে, জানালেন একদিন গোবিন্দ সে কথা প্রভুকে। তিনিও, স্বরূপের কাছ থেকে ব্যাপারটা ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে তার উত্তরে সেদিন বলেছিলেন তাকে যে-কথাটি, ভুভারতে কোথায়ও বুঝি তার কোন নজির নেই !

ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার।
সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার॥

মনে হয়, যেখানে মহাপ্রভুর ন্যায় কায়মনোবাক্যে সর্বত্যাগী গুরু, আর রঘুনাথ দাসের মতো সর্বত্যাগী শিষ্য, কেবল সেখানেই একথা বলা সাজে !

দেখা যাক এবারে, সিংহদ্বার ছেড়ে এসে কী পান রঘুনাথ ছত্রে ভিক্ষে ক'রে—

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়।
দুই তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি যায়॥
সিংহদ্বারে গবী আগে সেই ভাত ডারে।
সড়াগন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানী॥
ভিতরের দঢ় ভাত মাজি যেই পায়।
লোন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়॥

হঠাৎ একদিন স্বরূপ গোসাঁয়ের চোখে প'ড়ে যায় রঘুনাথের কাণ্ডটি। খানিকটা চেয়ে নিয়ে খেতে-খেতে (আনন্দে অধীর হ'য়ে)—

স্বরূপ কহে 'ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি।
আমাসবায় নাহি দাও। কি তোমার প্রকৃতি' ॥

পৌঁছে যায় কথাটা মহাপ্রভুর কানেও। একদিন ঠিক সময়মতো এসে প'ড়ে তিনিও—

'কাঁহা বস্তু খাও সবে আমায় না দেও কেনে' ?
এত বলি একগ্রাস করিল ভক্ষণে ॥

আর এক গ্রাস হাতে তুলে নিজেই, হাত চেপে ধ'রে ব'লে ওঠেন স্বরূপ—না, না, প্রভু এ তোমার জন্য নয়! অগত্যা থেমে গিয়ে (বলছেন চরিতকার)—

প্রভু বলে 'নিতি-নিতি নানা প্রসাদ খাই।
ঐছে স্বাদু আর কোন প্রসাদে না পাই' ॥

(৫)

মনে হয়, এতদিনে বোধহয় শেষ হ'য়ে এসেছিল রঘুনাথের ত্যাগ-তিতিক্ষার পরীক্ষা। আর তাই একক্রমে তিন বছর ধ'রে স্মরণ-মননের সময় পরতেন তিনি নিজের গলায় যে-গুঞ্জমালাটি, সেটিকেও সেইসাথে, কখনও বুকে কখনও মাথায় রেখে, আবার কখনও বা চোখের জলে সিক্তি ক'রে ক'রে, বলতেন যাকে 'কৃষ্ণকলেবর', সেই গোবর্ধন-শিলাটিকেও, এবারে রঘুনাথকে দিয়ে-দিয়ে, বলতে শোনা যায় প্রভুকে—

এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥
এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥

এরূপ সাত্ত্বিক-পূজোর উপকরণের কথায় বলা হ'ল—

এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী।
সাত্ত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥
দুই দিকে দুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥

চলতে থাকে এইভাবে রঘুনাথের সাত্ত্বিক পুজো স্বরূপগোসাঁই-এর সাহায্য ও সাহচর্যে। মনে-মনে ভাবেন রঘুনাথ—কেন, কী উদ্দেশ্যে দিয়েছেন তাঁকে প্রভু

তার এতো আদরের গুঞ্জমালা ও গোবর্ধন-শিলাটি! ভাবতে-ভাবতে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে যায়—

শিলা দিয়া মোরে গোসাঁই সমর্পিলা গোবর্ধনে।
গুঞ্জমালা দিয়া দিল রাধিকা চরণে ॥

এইভাবে নানা উপলক্ষ্যে প্রভুর দয়ার কথা স্মরণ হতেই, হয়ে যান রঘুনাথ আনন্দে আত্মহারা—ঘ'টে যায় তাঁর বাহ্যবিস্মৃতি! এবং কেবল একবার দু'বারই নয়, বারবার ক'রেই বলতে শুনা যায় তাঁকে তাঁর স্বরচিত স্তবাবলীতে—'গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি'—সেই গৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদিত হ'য়ে আমাকে আনন্দে পাগল ক'রে তুল্ছেন! ভক্তের কাছে এ অপেক্ষা কাম্য আর কী-ই বা হ'তে পারে?

অন্যদিকে রঘুনাথের ত্যাগ-তপস্যার কথাতেও, আগে যা বলা হয়েছে তাছাড়া, চৈতন্যচরিতকারের অন্য একটি উক্তির উল্লেখ করেই, প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করছি—

অনন্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা।
রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা ॥
সাতে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে।
আহার নিদ্রা চারিদণ্ড, সেহো নহে কোনদিনে ॥
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন।
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥
ছিঁড়াকানি কাঁথা বিনু না পরে বসন।
সাবধানে কৈল প্রভুর আদেশ পালন ॥
প্রাণরক্ষালাগি যেবা করেন ভক্ষণ।
তাহা খাঞা আপনারে কহে নির্ব্বেদবচন ॥

বাসুদেব সার্বভৌম ও রাজা প্রতাপরুদ্র প্রসঙ্গে

(১)

এক-এক ক'রে সকল ভক্তদেরই বিদায় দিয়ে, অদ্বৈতাচার্যের বিশেষ অনুরোধে কেবল নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত, এই চারজনকে মাত্র সঙ্গে নিয়ে শান্তিপুর থেকে রওনা হ'য়ে পড়লেন মহাপ্রভু নীলাচল উদ্দেশ্যে। দিনের-পর-দিন চলতে-চলতে রেমুণায় 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ', যাজপুরে বরাহ ও কটকে সাক্ষী গোপাল দেখে, এসে পৌছিলেন সকলে একদিন ভুবনেশ্বরপথে ভার্গী-নদীর তীরে। নিত্যানন্দের হাতে নিজের দণ্ডটি দিয়ে, নদীতে স্নান ক'রে নিলেন প্রভু ও তারপর আবারও হাটতে শুরু ক'রে, দূরথেকে জগন্নাথের দেউল চোখে পড়তেই প্রেমে আবিষ্ট হ'য়ে নাচগান-হুংকারগর্জন করতে-করতে এসে পৌছিলেন আঠার নালায়। এতক্ষণে খোঁজ পড়ল দণ্ডটির। কিন্তু কোথায় কি? আপন ভাবের বশে আগেই নিত্যানন্দ সেটিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো ক'রে ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীর জলে। কাজেই কী আর করা যায়! ক্ষোভ ক'রে বলতে লাগলেন প্রভু সবাইকে—

নীলাচলে আসি মোর সভে হিত কৈলা।
সবে দণ্ডধন ছিল তাহা না রাখিলা॥
তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে।
কিবা আমি আগে যাব, না যাব সহিতে॥

তাই হ'ল। সবাইকে পাছে ফেলে প্রায় ছুটতে-ছুটতে মন্দিরে পৌছে আবেগভরে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করতে যেতেই মাটিতে পড়ে গিয়ে হ'য়ে গেলেন প্রভু একেবারে বাহ্যশূন্য! চারদিকে হৈ! চৈ! পড়ে গেল। মারমুখ হ'য়ে ছুটে এল পাণ্ডারা। ভাগ্যে পণ্ডিত সার্বভৌম উপস্থিত ছিলেন, তাই রক্ষে! যদিও চিনতেন না তিনি প্রভুকে, তবুও—

প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার।
দেখি সার্বভৌমের হৈলা বিস্ময় অপার॥

কেটে গেল কিছুক্ষণ। হ'য়ে এল ভোগের সময়। তবুও প্রভুর চৈতন্য হচ্ছে না, মহাচিন্তিত সার্বভৌম লোকজন দিয়ে ধরাধরি করিয়ে সন্তর্পণে নিয়ে

এলেন তাঁর অচেতন দেহটিকে নিজের বাড়ীতে ও তারপর—

সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল॥
বসি ভট্টাচার্য মনে করেন বিচার।
এই কৃষ্ণমহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার॥

আর ভাবেনও তিনি সেই সাথে—কে এই মহাপ্রেমিক পুরুষ?

চলেছে যখন এই অবস্থা পণ্ডিত সার্বভৌমের বাড়ীতে, ততক্ষণে এসে পৌছে গেছেন গৌড়ের ভক্তেরা জগন্নাথের সিংহদ্বারে। কিন্তু কই? কোথায় প্রভু! অবশেষে লোকের মুখে পাওয়া গেল সব খবর, আর সেই সাথে এসে পড়তে দেখা গেল গোপীনাথ আচার্যকেও, যাঁর সাথে আগে থাকতেই পরিচয় ছিল মুকুন্দ দত্তের—নদীয়ার কোন একজনের জামাই ও মহাপ্রভুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ব'লে। যথাযোগ্য সম্ভাষণাদির পরে, সকলকে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন গোপীনাথ, পণ্ডিত সার্বভৌমের বাড়ীতে। প্রভুকে দেখে সকলেই আনন্দিত হ'লেন এবং সেই সঙ্গে দুঃখিতও হ'লেন তাঁর অবস্থা দেখে। আদর-আপ্যায়নের পরে, নিজের ছেলেকে সাথে দিয়ে পাঠালেন সার্বভৌম সকলকেই জগন্নাথ দর্শন করতে। ভক্তেরা ফিরে আসতেই শুরু হ'য়ে গেল উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তন ও তারপর কীর্তন চলতে-চলতে বেলা প্রায় তিনপ্রহরের সময় সংজ্ঞা লাভ ক'রে উঠে বসলেন প্রভু হুংকার দিয়ে 'হরি! হরি!' বলতে-বলতে! একে-একে সকলের সাথেই হ'ল তার আলাপ-পরিচয়। প্রভুর পরিচয় পেয়ে, বললেন তাঁকে সার্বভৌম পরম শ্রদ্ধাভরে—

সহজেই পূজ্য তুমি আর ত সন্ন্যাস।
অতএব জানিহ আমি তোমার নিজ দাস॥

পণ্ডিত শিরোমণি, তারপর—অন্যের আর কথা কী—বড়-বড় সন্ন্যাসীরাও যাঁর কাছে বেদান্ত শিখতে আসেন, এমন যে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, তাঁর মুখ থেকে এমন কথা শুনা মাত্রই বিষ্ণুস্মরণ করতে-করতে স্বভাবসুলভ দীনভাবে প্রভুকেও প্রত্যুত্তরে বলতে শুনা যায়—

আমি বালক সন্ন্যাসী ভালমন্দ নাহি জানি।
তোমার আশ্রয় লৈলুঁ গুরুকরি মানি॥

বলাবাহুল্য, মহাপ্রভু ও পণ্ডিত সার্বভৌম উভয়েরই আজকের এই যে উক্তিগুলো, এ কেবল কথার-কথাই ছিল না। শেষপর্যন্তও এভাব ছিল

অব্যাহত ; বরং দিন-দিন হ'য়ে উঠেছিল আরও বেশী প্রগাঢ়—আরও বেশী গভীর !

(২)

এরপর ফাল্গুন ও চৈত্রমাস নীলাচলে সার্বভৌম ও আর-আর ভক্তদের সাথে কাটিয়ে, বৈশাখের প্রথমেই যাত্রা করলেন মহাপ্রভু দক্ষিণের তীর্থভ্রমণে। সকলের একান্ত আগ্রহে, সঙ্গে রইল কেবল সেবক একজন। এই উপলক্ষ্যে পণ্ডিত সার্বভৌমের কথামতো, দেখা হ'য়েছিল তাঁর গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের সাথে আর দিনের পর-দিন ধ'রে চলেছিল সেই বহুবিশ্রুত বাহ্য থেকে অন্তর, অন্তর থেকে অন্তরতর—অন্তরতম সাধ্যসাধন তত্ত্বালাপ। কেবল তাই-ই নয়, এই মিলনের ফলে কিছুদিন যেতে না-যেতেই চিরদিনের মতো সকল রাজকার্য্য—সকল রাজৈশ্বর্য্য ছেড়ে দিয়ে এসে, দেখা যায় রায় রামানন্দকে নীলাচলে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার নিত্যসঙ্গী হতেও।

যাহোক, এমনি ক'রে যখন শুরু হয়ে গিয়েছিল মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-বিজয়, তখন অন্যদিকে জগন্নাথ ক্ষেত্রে তাঁর গুণপনার কথা, বিশেষ ক'রে পণ্ডিত সার্বভৌমের প্রতি কৃপার বিবরণ শুনে, স্বচক্ষে তাঁকে একবার দেখার জন্য নিতান্তই উৎসুক হ'য়ে পড়তে দেখা যায় রাজা প্রতাপরুদ্রকেও। পণ্ডিত সার্বভৌমের মুখে মহাপ্রভুর নীলাচল ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার খবর শুনে অনুযোগের সুরে একদিন বলতে শুনা যায় রাজাকে—

রাজা কহে 'তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলা।
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেননা রাখিলা' ॥

তা, পণ্ডিতেরই বা দোষ কী ? আর রাজা প্রতাপরুদ্রও জানতেন না তখনও, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম এখন আর কেবল একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিতই নন, কম বেশী দুমাস ধ'রে মহাপ্রভুর নিরন্তর সঙ্গের ফলে, হ'য়ে প'ড়েছেন তিনি এখন তাঁর একজন পরম অনুরাগী ভক্ত,—ভাবতে আরম্ভ ক'রেছেন তাঁকে স্বয়ং কৃষ্ণ—স্বতন্ত্র ঈশ্বর ব'লে, যাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে ধরে রাখবার মতো ক্ষমতা তাঁর নিজের কেন, কোন কারও ছিলনা ! যাহোক, সব কথা জেনে শুনে শেষ পর্যন্ত কাতরভাবে পণ্ডিত সার্বভৌমকে অনুরোধ ক'রে বললেন রাজা প্রতাপরুদ্র—

'ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ' তাতে সত্য মানি ॥

পুনরপি ইহা তাঁর হৈলে আগমন।
একবার দেখি, করি সফল নয়ন॥

দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে এসে উঠেছেন প্রভু কাশীমিশ্রের ঘরে। একে-একে নীলাচলের সকল ভক্তদেরই তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। তারপর সকলের ইচ্ছায় নদীয়ায় লোক পাঠান হ'ল তাঁর প্রত্যাবর্ত্তনের খবর দিয়ে। এসে প'ড়েছেন এর মধ্যে বারাণসী থেকে স্বরূপ-দামোদর, যাঁকে দেখামাত্রই ব'লে উঠেছিলেন মহাপ্রভু—

'তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল'॥

এছাড়াও এসেছেন ঈশ্বরপুরীর সেবক গোবিন্দ, পুরীজীর আদেশমতো তাঁর দেহত্যাগের পরে মহাপ্রভুর সেবা করতে। এসে গেছেন ক'জন বিশিষ্ট অতিথিও এখান-ওখান থেকে।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন জানালেন সার্বভৌম মহাপ্রভুকে, রাজা প্রতাপরুদ্রের আকুল আবেদন তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য। কিন্তু—কথা শেষ হতে না-হতেই, 'নারায়ণ'। 'নারায়ণ'! বলতে-বলতে কানে হাত দিয়ে ব'লে উঠলেন প্রভু—

'সার্ব্বভৌম! কহ কেন অযোগ্য বচন।
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন॥
স্ত্রীদরশনসম বিষের ভক্ষণ।

*　　*　　*

ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
কহ যদি তবে আমা হেথা না দেখিবে॥'

রকম-সকম দেখে, অগত্যা চুপ ক'রেই যেতে হ'ল পণ্ডিতকে,—ভয়ে তাঁর আর মুখ দিয়ে কথা বেরোলো না! এর কতদিন পরে রাজার সাথে আবার দেখা হতে, তাঁকে যাসব ব'লেছিলেন সার্বভৌম, তা শুনে এবারে রাজাকে খেদ ক'রে বলতে শুনা যায় (চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষায়)—

পাপী নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার!
জগাই-মাধাই করিয়াছেন উদ্ধার॥
'প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিব জগৎ নিস্তার'।
এই প্রতিজ্ঞা করি জানি করিয়াছেন অবতার॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা—'মোরে না করিবে দরশন'।
মোর প্রতিজ্ঞা—'তাহা বিনা ছাড়িব জীবন'॥

কী আর করেন সার্বভৌম! যাহোক অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত একটা উপায় ঠাওরে—

ভট্টাচার্য্য কহে 'দেব, না কর বিষাদ।
তোমারে প্রভুর অবশ্য হইবে প্রসাদ॥

* * *

রথযাত্রাদিনে প্রভু সবভক্ত লঞা।
রথ আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ।
সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ॥
কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে ধরিবে যাই মহাপ্রভুর চরণ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণনাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি॥'

সার্বভৌমের কথায় যেন অকূলে কূল পেলেন রাজা—

শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল।
প্রভুরে মিলিতে মনে এই দৃঢ় কৈল॥

অন্যদিকে, রাজা প্রতাপরুদ্রের সম্মতি নিয়ে রাজকার্যে ইস্তফা দিয়ে এসে পড়েছেন রায় রামানন্দ নীলাচলে। রাজার সাথে দেখা হতেই, অন্য কথার পরে বললেন তাঁকে রাজা—'তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন। নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্যচরণ॥' এরপরই গিয়েছিলেন রামানন্দ মহাপ্রভুর সাথে দেখা করতে ও বলেছিলেন তাঁকে রাজা প্রতাপরুদ্রের কথায়—

[তাঁহার] যে প্রেম-আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥

প্রেমিকের স্বভাবই এই, অন্যের ভালবাসার তুলনায় নিজের ভালবাসাকে সে সর্বদা ছোট ক'রেই দেখে! যাহোক সার্বভৌমের কথার পরে, আবারও রায় রামানন্দকে রাজার সম্বন্ধে এভাবে বলতে শুনে, বোধহয় পাহাড়ের গায়েও এবারে একটা ফাটল দেখা দিয়েছিল!

প্রভু কহে 'তুমি কৃষ্ণভক্ত প্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান ।।
তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিবেন অঙ্গীকার ।।'

(৩)

দেখতে-দেখতে প্রায় রথযাত্রা এসে পড়ল। একদিন খবর পাওয়া গেল, গৌড় থেকে প্রায় দুশোজন ভক্ত নীলাচল আসার পথে, এসে পৌঁছে গেছেন নরেন্দ্র সরোবরে। ধ'রে বসলেন রাজা প্রতাপরুদ্র পণ্ডিত সার্বভৌমকে—দেখাতেই হবে তাঁকে এক-এক ক'রে গৌড়ের সকল ভক্তদেরই। ভাল ক'রে দেখার সুবিধা হবে ব'লে, তাঁকে ও গোপীনাথ আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে উঠা হল এক উঁচু অট্টালিকার ছাদে। চিনতেন গোপীনাথ সকলকেই। কাজেই তাঁর উপরেই গৌড়ের ভক্তদের চিনিয়ে দেবার ভার পড়ল। উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করতে-করতে ভক্তেরা কাছাকাছি এসে পড়তেই, মহাপ্রভুর আদেশমতো স্বরূপ গোসাঁই ও সেবক গোবিন্দ এগিয়ে গিয়ে যেমন-যেমন এক-এক ক'রে তাঁদের সকলেরই গলায় প্রসাদীমালা পরিয়ে দিতে লাগলেন, অমনি অধীর আগ্রহে তাঁদের প্রত্যেকেরই পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে উঠতে লাগলেন রাজাও। এইভাবে পরিচয়পর্বের শেষে, বিস্মিত রাজাকে বললেন সার্বভৌম, তাঁর প্রশ্নের উত্তরে—'চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেমসংকীর্তন'—এই নামসংকীর্তন প্রবর্তন করতেই তো চৈতন্যঅবতার !

এরপর কিন্তু একটা খট্‌কা লেগে যায় রাজার মনে। আগে জগন্নাথ মন্দিরে না গিয়ে, সকলকেই সোজা মহাপ্রভুর বাসার দিকে যেতে দেখে, বেশ-একটু বিস্মিত হ'য়েই কারণ জিজ্ঞাসা করেন রাজা, সার্বভৌমকে। লোকে জানে, তীর্থস্থানে এসে ধুলোপায়েই যেতে হয় দেবদর্শনে। কাজেই রাজার পক্ষে এদিনের এ বিস্ময় কিছুই অস্বাভাবিক ছিল না। যাহোক এবারের মতো তাকে আর বেশী কিছু না ব'লে, শুধুমাত্র বললেন সার্বভৌম—'আগে তাঁরে মিলি সবে, তাঁরে আগে লঞা। তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥' আবারও রাজার মনে আর একটা প্রশ্ন উঠতে দেখা যায়। পাঁচ সাতজন লোককে প্রচুর প্রসাদান্ন নিয়ে কাশীমিশ্রের বাড়ীর দিকে যেতে দেখে, রাজার মনে প্রশ্ন জাগে—তীর্থস্থানে এসে তীর্থকৃত্যাদি শেষ না হতেই প্রসাদপাবার জন্য এতো আয়োজন কেন? লোকাচার হিসেবে ও সেইসঙ্গে রাজার বর্তমান মনের অবস্থা বিবেচনায়, এ প্রশ্নটিকেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই বলতে হয়। শুধু

লোকাচারই বা কেন? একথাটাও সর্ববাদিসম্মত যে, কেবল সৎগুরুর সুস্পষ্ট নির্দেশে, অথবা রাগভক্তি বা ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভের পরেই বৈধীভক্তি বা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা চলে। অন্যথায় ব্যাভিচার ঘটে--ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃই হ'য়ে থাকে! এবিষয়ে, প্রসঙ্গক্রমে স্বয়ং মহাপ্রভুর আচরণও লক্ষণীয়। পণ্ডিত সার্বভৌমের ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মহাপ্রভুর সম্বন্ধে তাঁর ধারণার আমূল পরিবর্তন, ষড়ভুজদর্শন, ও এমনি সব ঘটনার পরেও, একদিন জগন্নাথ দর্শন না করেই তাঁকে তাঁর কাছে উপস্থিত হ'তে দেখে, তখনই পাঠিয়েছিলেন প্রভু পণ্ডিত সার্বভৌমকে জগন্নাথ দর্শন করতে। ক্ষুধার্ত বালক রঘুনাথ দিনের-পর-দিন অনাহার-অনিদ্রায় পথ চলতে চলতে কোনমতে সপ্তগ্রাম থেকে নীলাচল এসে পৌঁছিলে, ব'লেছিলেন তিনি তাঁকে আগে সমুদ্রস্নান ও জগন্নাথ দর্শন ক'রে এসে তবে সেবক গোবিন্দের কাছে প্রসাদ পেতে। নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে, ক্ষেত্রসন্ন্যাস ত্যাগ ক'রে পরমভক্ত গদাধর পণ্ডিতকে তাঁর অনুগামী হ'তে দেখে, যে-কঠোর ভৎ'সনা ক'রে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন তিনি তাঁকে নীলাচলে, তার বর্ণনা পাওয়া যায় মধ্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদে। কঠোর থেকে কঠোরতর ভাষায় ব'লেছিলেন তিনি সেদিন পণ্ডিত গদাধরকে—'মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল। আমার শপথ যদি আর কিছু বল॥' এমনি ক'রেই দিতে পারা যায় আরও সব দৃষ্টান্ত। তবে এক্ষেত্রে, এতে ক'রে যে কোনই দোষ হয়নি, তার প্রমাণস্বরূপ নিজের সম্বন্ধেই অন্য একদিনের অনুরূপ একটা ব্যাপারের উল্লেখ ক'রে বলতে শুনা যায় এবারে পণ্ডিত সার্বভৌমকে—

পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল॥
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয়ে সেই ছাড়ে বেদ-লোকধর্ম্ম॥

সেই সেদিন ঘুম থেকে উঠে চিরকালের অভ্যাসমতো স্নানসন্ধ্যা সারার আগেই বিছানায় ব'সে-ব'সে পরম নিষ্ঠাবান পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে তাঁর কথায় এইভাবে প্রসাদান্ন গ্রহণ করতে দেখে, পরম উল্লাসে যে কাণ্ডটি ক'রেছিলেন মহাপ্রভু, তার বর্ণনায় এই প্রসঙ্গে বলতে শুনা যায় 'চরিতামৃতে'—

দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন॥
দুইজনে ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভুভৃত্য দোঁহা স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন॥

স্বেদ-কম্প-অশ্রু, দোঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা॥
'আজি মুঞি অনায়াসে জিনিলু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ॥
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন;
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদধর্ম্মলঙ্ঘি কৈলে প্রসাদভক্ষণ'॥

দক্ষিণেশ্বরে একদিন অদ্বৈত-বেদান্তের গুরু শ্রীমৎ তোতাপুরীকে ও পরে অন্যদিন অদ্বৈতবাদী নরেন্দ্রনাথকেও মা-কালী অর্থাৎ শক্তি মানতে দেখে, যে-আনন্দ হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের, অথবা বেদনিষ্ঠ মণ্ডন মিশ্রকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে আচার্য শঙ্কর যেদিন তাঁকে বেদান্তে বিশ্বাসী করাতে পেরেছিলেন, সেদিন তিনি যে-আনন্দ লাভ করেছিলেন, মহাপ্রভুর আজকের এই বিজয়োল্লাস বোধহয় কেবল তারই সাথে তুলনার যোগ্য! দেখাও যায়, একা পণ্ডিত সার্বভৌমকে জয় ক'রেই, মহাপ্রভু কার্যতঃ সকল নীলাচলবাসীরই হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছিলেন। এই যে তাঁর প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের এত অনুরাগ, এরও মূলে ছিল পণ্ডিত সার্বভৌমেরই অনুপ্রাণনা।

কিন্তু এসত্ত্বেও কথা উঠতে পারে, এতে এতটা মহোল্লাসই বা কেন? এ ব্যাপারে এমন আর কী দেখেছিলেন—কী বুঝেছিলেন মহাপ্রভু যার ফলে হ'য়ে প'ড়েছিলেন তিনি এতটাই আত্মহারা, তাঁর মুখ দিয়ে ভাবাবেগে নির্গত হ'য়েছিল এইসব দিব্যবাণী, বর্ষিত হ'য়েছিল পণ্ডিত সার্বভৌমের মাথায় এতসব অদ্ভুত-অশ্রুতপূর্ব আশীর্বাদ? উত্তরে বলতে হয়, মহাপ্রভুর মনের ভাব অনুমান করা বা তাঁর আচরণের যথাযথ ব্যাখ্যা করা কারও পক্ষেই কখনও সম্ভব নয়। তবে একথাটাও ঠিক যে, একটা গোটা পাহাড় স্থানচ্যুত হওয়াও যদি বা সম্ভবপর হয়, মানুষের মন থেকে ধর্মাধর্মের দৃঢ়মূল সংস্কারের উচ্ছেদ বস্তুতঃ এক অসম্ভব ব্যাপারই! বিশেষ ক'রে পণ্ডিত সার্বভৌমের মতো কোন একজন দৃঢ়-নিষ্ঠাবান পণ্ডিতাগ্রগণ্য

ব্যক্তির পক্ষে হঠাৎ কোন-কারও কথায় এভাবে আজন্মসঞ্চিত ধর্মকর্মের—শুচি-অশুচির পূর্বসংস্কার মন থেকে মুছে ফেলতে পারাটা তো একেবারেই একটা অভাবনীয় ব্যাপার ! আর, সর্বসংস্কারমুক্তি মানেই তো 'দেহাদি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করা'—'কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য' হ'য়ে উঠা ! অবশ্য এখানে কথাটিতে মহাপ্রভু যে, শুদ্ধাভক্তি লাভেরই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তা বোধহয় বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গক্রমে তাই স্মরণীয় শুদ্ধাভক্তিস্বরূপা ব্রজগোপীগণের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : আদিলীলা : চতুর্থ পরিচ্ছেদের উক্তিটিও—

লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম দেহধর্ম্ম কর্ম্ম
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম ॥
দুস্ত্যাজ্য আর্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎর্সন ॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।

এখানে 'লোকধর্ম্ম' বলতে বুঝতে হবে—লোকাচার বা স্মৃত্যাদির বিধান, 'বেদধর্ম্ম' অর্থে—বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি, 'দেহধর্ম্ম কর্ম্ম' অর্থে—দেহেন্দ্রিয়াদির স্বাভাবিক কর্মচেষ্টা এবং 'দুস্ত্যাজ্য আর্যপথ' অর্থে বুঝতে হবে পূর্বপূর্ব যুগের পাতিব্রত্যধর্ম্মাদি।

এবারে অন্যদিকে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজের সম্বন্ধেও বলতে হয়, অন্যকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্য ক'রে তোলার জন্যই তো ঈশ্বরের অবতাররূপে দেহধারণ—লীলাকরণ। সার্বভৌমের মতো একজনের উদ্ধারের অর্থ—লক্ষলোকের উদ্ধার। তাই, কেবল জীবোদ্ধারের জন্যই যাঁর ধরাধামে আগমন, এভাবে উদ্ধারপর্বশেষের সূচনা দেখে, তাঁর মনে বৈকুণ্ঠ-আরোহণ বা স্ব-স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের কথা এসে পড়লে, তাতে আর আশ্চর্য ছিল কী !

(৪)

যাহোক, এরপর সকল গৌড়ীয় ভক্তদেরই আহারাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে, ফিরে গেলেন রাজা কটকে ও তারপর দুই একদিন যেতে না যেতেই চিঠি লিখে অনুরোধ ক'রে পাঠালেন সার্বভৌমকে, যেন তাঁর হ'য়ে সকল ভক্তরাই মহাপ্রভুর কৃপাভিক্ষা করেন। চিঠিখানি পাবার পর, সকলে মিলে যুক্তি ক'রে স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুকে সামনে রেখে ভয়ে-ভয়ে এসে নিবেদন করা হ'ল মহাপ্রভুকে রাজার মিনতির কথাটা। তারপর (যেমন বলতে শুনা যায় চরিতকারকে)—

যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হৈল মন।
তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুর বচন ॥
'তোমাসবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া।
রাজারে মিলহ ইহোঁ কটকেতে গিয়া ॥
পরমার্থ থাকুক লোকে করিবে নিন্দন।
লোকে রহু, দামোদর করিবে ভৎ'সন ॥
তোমা সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে।
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে ॥'

চমৎকার! এক ছিলেন সনাতন, যাঁকে বলা হ'য়েছিল একদিন অন্তলীলায়—'আমাকেও বুঝাইতে ধর তুমি শক্তি। কতঠাঞি বুঝায়াছ ব্যবহার ভক্তি ॥' আর হ'লেন আজ স্বরূপগোসাঁই, যাঁর কথায় এবারে মধ্যলীলায় বলতে শুনা গেল—'দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে।' পরমার্থের কথা—লোকনিন্দার কথা ছেড়ে দিয়ে, স্বরূপ যে ভৎ'সনা করবে-এটাই হ'য়ে দাঁড়াল সবচেয়ে বেশী ভয়ের ব্যাপার! কিন্তু স্বরূপও তো নেহাৎ-একটা কচি ছেলে ছিলেন না! তাই,—

দামোদর কহে 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্তব্যাকর্তব্য সব তোমার গোচর ॥
আমি কোন ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব ॥
রাজা তোমায় স্নেহ ক'রে তুমি স্নেহবশ।
তাঁর স্নেহে করাবে তোমা তাঁহার পরশ ॥'

তুমি তো স্ব-তন্ত্র ঈশ্বর। যাকিছু করা উচিৎ বা অনুচিৎ, সে-সবই তো তুমি ভাল করেই জান। আমার মতো ক্ষুদ্রজীব একটা, কি আর বিধান দেবে তোমাকে? তবে হাঁ, একথাটাও ব'লে রাখছি—স্বতন্ত্র হ'লেও স্বভাবতঃই তুমি প্রেমাধীন; কাজেই রাজার ভালবাসার কাছে একদিন না একদিন তোমাকে ধরা দিতেই হবে!

যাহোক এরপর, স্বয়ং নিত্যানন্দের মধ্যস্থতায় ঠিক হ'ল—দেওয়া হবে রাজাকে এবারের মতো মহাপ্রভুর বহির্বাস একখানা। কাপড়খানি পেয়ে রাজার কী আনন্দ! নিজেকে অশেষ ভাগ্যবান মনে ক'রে—'রাজার হৈল আনন্দিত মন। প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ॥'

দুই একদিন পরেই, সুযোগ বুঝে আবারও একবার রায় রামানন্দ স্মরণ করিয়ে

দেন মহাপ্রভুকে রাজা প্রতাপরুদ্রের তাঁর সাথে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠার কথাটা। রায়ের কথা শুনে, তাঁর কাতর প্রার্থনায় নিজেও কাতর হ'য়ে, বলতে শুনা যায় এবারে প্রভুকে —

'রামানন্দ কহ বিচারিয়া।
রাজাকে মিলিতে জুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ?
আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসী।
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্বলোকে গায়'॥

বলতে বলতে এরপরেও—

প্রভু কহে 'পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা' নাম॥'

এসত্ত্বেও কিন্তু, সেই দু'দিন আগে রাজাকে নিজের একখানি বহির্বাস দেওয়ার পরে, এবারে রায় রামানন্দের প্রার্থনায় যেন আরও একধাপ এগিয়ে এসেই বলতে শুনা যায় মহাপ্রভুকে রাজার কথায়—

'তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ তুমি তাঁহার তনয়॥
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্রবাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি'॥

লক্ষ্য করার কথা—একের পর এক কী অপূর্ব কৌশলে রাজা প্রতাপরুদ্রের মনটাকে ক্রমে-ক্রমে শোধন ক'রে নিয়ে, করা হচ্ছে তাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করার ব্যবস্থা! রকম দেখে মনে এসে যায়—শ্রীরামকৃষ্ণের সেই বহুশ্রুত উপমাটির কথাই—'আরশোলা কাঁচপোকাকে ভাবতে-ভাবতে ক্রমে কাঁচপোকাই হ'য়ে গেল'!

মহাপ্রভুর কথা শুনামাত্রই, এক মুহূর্তও দেরী না ক'রে ছুটে গেলেন রামানন্দ রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে ও এনে হাজির করলেন রাজপুত্রকে প্রভুর দরবারে। শ্যামবর্ণ, কিশোর বয়স, পদ্মের মতো চোখদুটি, পীতাম্বর ও সেইসাথে রাজ-আভরণপরা ছেলেটিকে দেখেই মহাপ্রভুর মনে কৃষ্ণস্মৃতি উদ্দীপিত হ'য়ে উঠলো! প্রেমাবেশে তাকে আলিঙ্গন ক'রে বলতে লাগলেন তিনি—

'এই মহাভাগবত ! যাহার দর্শনে ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে' ॥

প্রভুস্পর্শে ছেলেটির অঙ্গেও দেখা দিল সাত্ত্বিক বিকার। নাচতে লাগল সেও 'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ' ! ব'লে। ঘরে সে রাজার কাছে ফিরে যেতে, রাজাও—

পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
সাক্ষাৎ স্পর্শন যেন মহাপ্রভুর পাইলা ॥

(৫)

এরপরই এসে পড়ল রথযাত্রা। শিষ্যদের নিয়ে করলেন প্রভু মহানন্দে গুণ্ডিচামন্দির মাজনা। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, অপূর্ব কাহিনী ! রথযাত্রাদিনে, চিরাচরিতপ্রথামতোই সোনার ঝাঁটা দিয়ে পথ ঝাঁট দিয়ে দিলেন নিজে রাজা প্রতাপরুদ্র। আরম্ভ হল তারপর ৺জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। স্বয়ং মহাপ্রভুও সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চলেছেন রথের আগে-আগে প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করতে-করতে। ভাবাবেগে কখনও দেহে নানা অষ্টসাত্ত্বিক বিকার দেখা দিচ্ছে, কখনও একেবারে মূর্ছিত হ'য়ে পড়ছেন। মণ্ডলী ক'রে-ক'রে ভক্তেরা লোক নিবারণ কচ্ছেন। অন্যদিকে, রাজা প্রতাপরুদ্রও পাত্রমিত্র নিয়ে কোনমতে লোকের ভিড় ঠেলে-ঠেলে চ'লেছেন অন্য সকলের সাথেই, প্রভুর অপরূপ নৃত্য দেখতে-দেখতে ভাবাবিষ্ট হ'য়ে। ভীড়ের চাপে এক-একবার আড়াল প'ড়ে যেতেই, রাজমন্ত্রী হরিচন্দন নিজের হাতে লোক ঠেলে দিয়ে প্রভুকে দেখবার পথ ক'রে দিচ্ছেন। রাজার ঠিক সামনের সারিতেই শ্রীবাসও চ'লেছিলেন নাচতে-নাচতে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে ! বারবার এভাবে ঠেলা খেতে-খেতে, রাগের মাথায় একবার এদিক-ওদিক না দেখেই, হঠাৎ তিনি এক চড় মেরে বসলেন মন্ত্রী হরিচন্দনের গায়ে ! অতর্কিতে এইভাবে চড় খেয়ে, ক্রুদ্ধ হরিচন্দনও যেমন শ্রীবাসকে বেশ একটু কড়া ক'রেই দুটো কথা শুনিয়ে দিতে যাচ্ছিলেন, অমনি তাঁর ভাবগতিক দেখে তাড়াতাড়ি ক'রে এগিয়ে এসে বাধা দিয়ে ব'লে উঠতে শুনা যায় রাজা প্রতাপরুদ্রকে—

[কর-কী !] 'ভাগ্যবান তুমি ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
মোর ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥'

ঘটনা হিসেবে যাই হোক না কেন, মহাপ্রভু ও ছোটবড় নির্বিশেষে তাঁর সকল ভক্তদের প্রতিই রাজা প্রতাপরুদ্রের যে কী গভীর শ্রদ্ধা ছিল—এটি তারই এক অসামান্য নিদর্শন ! এছাড়াও, এথেকে তাঁর নিরভিমানতা ও তিতিক্ষার যে-

পরিচয় পাওয়া যায়, জগতের ধর্মেতিহাসে তারও তুলনা মেলা ভার! বৈষ্ণবের গুণের কথায় অবশ্য বলতে শুনা যায়—'উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান'—মানবে আপনাকে 'তৃণাধম' ব'লে, কিন্তু ব্যবহারের কষ্টিপাথরে যাচাই না হওয়া পর্যন্ত বুঝে উঠা যায় না, কে যে প্রকৃত বৈষ্ণব কেই-বা অবৈষ্ণব!

যাহোক এইভাবে চলতে-চলতে, এসে দাঁড়াল রথখানি পুষ্পোত্যানের কাছাকাছি। শুরু হ'য়ে গেল যে-যা পারে তাদিয়েই জগন্নাথের বিরাট ভোগ নিবেদন। এই অবকাশে কীর্তনীয়ারাও কীর্তন ছেড়ে দিয়ে বাগানে ঢুকে, যে-যাঁর মতো একটু বিশ্রাম নিতে লাগলেন। মহাপ্রভুকেও দেখা গেল শ্রান্তক্লান্ত দেহখানি নিয়ে বাগানের বারান্দাটির একপাশে চোখবুজে প'ড়ে থাক্‌তে। সার্বভৌমের কথামতো এদিনের এই সুযোগটিরই প্রতীক্ষায় ছিলেন রাজা এতদিন। কাজেই এবারে মুহূর্তমাত্রও দেরী না ক'রে -

সার্বভৌম উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ।
একলা বৈষ্ণববেশে করিলা প্রবেশ॥
সব ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়হাত হঞা।
প্রভুপাদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া॥
আঁখি বুজি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন।
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদসম্বাহন॥
রাসলীলা শ্লোক পড়ি করেন স্তবন।
'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় করেন পঠন॥
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার।
'বোল' 'বোল' বলি প্রভু বোলে বারবার॥
'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িলা।
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈলা॥
'তুমি মোরে বহু দিলা অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি, দিনু আলিঙ্গন॥'
এতবলি সেই শ্লোক পড়ে বারবার।
দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার॥
প্রভু বোলে, 'কে তুমি? করিয়া মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত?'

রাজা কহে 'আমি তোমার দাসের দাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ॥'

এইভাবে সেদিন রাজা প্রতাপরুদ্রের সাথে মিলনের পরে, দেখিয়েছিলেন প্রভু তাঁকে তাঁর ঐশ্বর্যমূর্তিও, কিন্তু নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন সে-কথা প্রকাশ করতে। এরপর থেকেই গণ্য হ'তে দেখা যায় রাজাকে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে একজন ব'লে। পরে, নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে আবারও প্রভুর সাথে প্রতাপরুদ্রের কটকে যে-মিলন ঘটেছিল, তার বর্ণনাশেষে বলতে শুনা যায় চরিতকারকে—

ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈলা গৌরধাম।
'প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা' জগতে হৈলা নাম॥

এইভাবে এখানে যা বলা হয়েছে, তাছাড়া আরও অনেক কথাই শুনতে পাওয়া যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রাজা প্রতাপরুদ্র, বিশেষ ক'রে পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম সম্বন্ধে। তবে, একদিকে এঁদের মতো গৃহী ও অন্যদিকে রূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস ও ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় গৃহত্যাগী, ভক্ত বা পার্ষদগণকে নিয়ে এপর্যন্ত যতটুকু যা আলোচনা করা হয়েছে, তা থেকেই ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর অপরূপ শিষ্যব্যবহারের একটা সুমধুর ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া গিয়েছে বলেই মনে হয়। কাজেই, এরপর ভক্ত ছোট হরিদাসের ব্যাপারে এ বিষয়ে আপাতদৃষ্টিতে যে-বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, কেবল সে-সম্বন্ধে কিছু একটু আলোচনা করেই এই প্রসঙ্গে কথা শেষ করতে ইচ্ছে করি।

ছোট হরিদাস প্রসঙ্গে

এবারে ছোট হরিদাসের কথা। অন্যসব শিষ্য বা পার্ষদগণের বেলায় দেখা যায়, নানা দিক্‌-দেশ থেকে আগত নদনদী যেন শ্রীচৈতন্যসাগরে এসে মিলিত হয়েই পরিপূর্ণতা লাভে ধন্য হ'য়েছিল। অন্য পক্ষে ছোট হরিদাসের ক্ষেত্রে কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে ঠিক তেমনটি না হয়ে, ঘটতে দেখা যায় এর এক ব্যতিক্রম। অন্য সব মিলনান্ত নাটকের বদলে এটি যেন একটি করুণ বিয়োগান্ত নাটক! ছোট হরিদাসের সাথে মহাপ্রভুর এই-যে লীলা—এই-যে ব্যবহার এর রহস্যোদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে, মহাপ্রভুর নিজ মুখের কথা ও অন্তরঙ্গ শিষ্য বা ভক্তগণের বক্তব্যকে উপজীব্য ক'রে, যে যেমন পেরেছেন তেমনি চেষ্টা ক'রে এসেছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও এবিষয়ে বলতে শুনা যায়—

আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্যশিক্ষণ।
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ॥
তীর্থের মহিমা, নিজ ভক্তে আত্মসাৎ।
এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ-সাত॥
মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র গম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥

তবেই হোলো! সেই একই কথা—'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূণি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমিশ্বরঃ॥'—বজ্রের মতো কঠোর আবার কুসুমের চেয়েও কোমল এমন যে লোকোত্তর পুরুষগণের চরিত্র, কে আর তার স্বরূপ অবগত হতে সমর্থ? কাজেই, ব্যাপারটা যে বেশ একটু দুর্বোধ্য তাতে আর সন্দেহ কী? তবে এই সঙ্গে এও বলতে হয় যে, মহাপ্রভুর চরিত্র অন্ততঃ কিছুটাও যে ঠিকভাবে বুঝবার চেষ্টা করেছে—তাঁর বিশাল হৃদয়, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, সর্বোপরি সকলের প্রতি সুমধুর প্রেমপূর্ণ ব্যবহারের একটুও পরিচয় যে পেয়েছে, তার পক্ষে ছোট হরিদাসের প্রতি তাঁর এরূপ ব্যবহারকে নেহাৎ একটা খামখেয়ালি বা হঠকারিতার নিদর্শন ব'লে মনে করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। অন্যপক্ষে, এবিষয়ে তিনি যে কিছু একটা ভুল ক'রে ফেলেছিলেন, এমন কোন আভাসও পাওয়া যায় না কোনো কোথায়ও তাঁর নিজের কথাবার্তা বা কাজকর্মের মধ্যে। বরং সে-সবে, তিনি যে সব জেনেশুনেই—সবদিক ভাল ক'রে ভেবে-

চিন্তেই, যা করবার করেছিলেন—যা বলবার বলেছিলেন, তারই পাওয়া যায় সুস্পষ্ট পরিচয়।

ছোট হরিদাস ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গের ভক্ত-কীর্তনীয়া। সব কিছু ত্যাগ ক'রে এসে মহাপ্রভুর নিরন্তর সঙ্গ ও কীর্তন শুনিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টাই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। এই নীলাচলেরই অন্য গণ্যমান্য ভক্তদের মধ্যে পণ্ডিত ভগবান আচার্যও ছিলেন একজন। মাঝে মাঝে তিনি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতেনও। এমনি এক উপলক্ষ্যেই, একদিন চারটি ভাল চাল চেয়ে আনতে পাঠিয়েছিলেন তিনি হরিদাসকে 'বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী' মাধবীদেবীর কাছে। খেতে বসে, ভাত দেখে বিস্মিত প্রভু তাঁর প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারেন কথাটি; কিন্তু তখনকার মতো কোন আর উচ্চবাচ্য না ক'রে, অন্নের প্রশংসা করতে-করতে খাওয়া শেষ ক'রে নিজের বাসায় ফিরে এসে, বললেন সেবক গোবিন্দকে ডেকে—

আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা।
ছোট হরিদাসে ইহা আসিতে না দিবা॥

যেকথা—সেই কাজ! মনের দুঃখে প'ড়ে আছেন হরিদাস তিন দিন ধ'রে উপোস ক'রে। অথচ কেউই আর ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না; বা মহাপ্রভুর হাবভাব দেখে, তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও কারও সাহসে কুলিয়ে উঠছে না। যাহোক শেষ পর্যন্ত স্বরূপগোসাঁইকে সঙ্গে নিয়ে, একদিন ভক্তেরা ভয়ে-ভয়ে নিবেদন করলেন প্রভুকে—

কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস?
কি লাগিয়া দ্বারমানা? করে উপবাস।

'অপরাধ?' গর্জে উঠে প্রভু কহে—

বৈরাগী হৈঞা করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারুপ্রকৃতি হরে মুনিজনের মন॥
ক্ষুদ্রজীব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

বলতে-বলতে ভাবাবেগে সকলকে ছেড়ে একা-একাই ঘরে ঢুকে পড়লেন। হ'ল না সেদিন কারও সাথে কোন আর কথাবার্তা।

এরপর আবারও একদিন সকলে মিলে ধ'রে বসলেন—

'অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।
এবে শিক্ষা হৈল, আর না করিবে অপরাধ ॥'

সকলের কথা শুনে, সেই আগের স্বরেই—

প্রভু কহে, 'মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতিসম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন ॥
নিজ কার্য্যে যাও সবে, ছাড় বৃথা কথা।
পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবা হেথা ॥'

এই যে এখানে কথাটি—'প্রভু কহে, 'মোর বশ নহে মোর মন'—এর অর্থটা বস্তুতঃ কী? এতে ক'রে কি বুঝতে হবে যে, অন্যলোকের মতোই মহাপ্রভুরও নিজ মনের উপরে কোন কর্তৃত্ব—কোনরূপ নিয়ন্ত্রণের শক্তি ছিল না? বলাই বাহুলা, মহাপ্রভুর ন্যায় 'দৃঢ়নিশ্চয়মানসবান'[১] অবতার পুরুষগণের সম্বন্ধে এরূপ ভাবনার কোন অবকাশই থাকতে পারে না। কাজেই, দেখে শুনে এখানে বরং অন্যভাবের—এর বিপরীত ভাবের কথাটাই মনে এসে যায়। সমস্ত লৌকিক দৃষ্টি—সকল জাগতিক মায়া-মমতার উর্ধ্বে উঠে, সকল কর্তৃত্বাভিমান নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে, কেবল সেই শুদ্ধমন—শুদ্ধআত্মা বা পরমকারণ কৃষ্ণেরই যন্ত্রস্বরূপ হয়ে, তাঁরই ইঙ্গিতেই যে ক'রে যাচ্ছেন তিনি যা কিছু তথাকথিত ভালমন্দ—প্রিয়-অপ্রিয় কাজ, এখানে কথাটিতে যেন তারই আভাস পাওয়া যায়। এই ঐশী ইচ্ছার বশেই তাঁর মন "প্রকৃতিসম্ভাষী" বৈরাগীকে দেখতে অনিচ্ছুক হ'য়েছিল, এবং প্রয়োজন হ'লে ভক্তগণের সঙ্গ পর্যন্তও ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল। এতে ভালমন্দ—যুক্তি বিচারের কোন অবসরই ছিল না। এক দিক দিয়ে একেই, গোটা ব্যাপারটারই একটা সমাধানসূত্র ব'লেই হয়তো-বা ধরে নেওয়া চলতে পারে। অন্য একদিনও, এই নীলাচলেরই পরমপ্রিয় ভক্ত রায়-রামানন্দের ভাই গোপীনাথের আসন্ন চরম রাজ-দণ্ডের খবর শুনে, প্রতিকারের উপায় থাকতেও তাঁর নির্বিকার হ'য়ে থাকার মূলেও, মনে হয়, এই ভাবেরই প্রেরণা ছিল। এই ঐশী প্রেরণার বশেই দেখা যায় তাঁকে কখনও সচেষ্ট, কখনও-বা নিশ্চেষ্ট।—'করি যেবা করান মুরারি!'

যাহোক প্রভুর কথা শুনে, চুপ-চাপ ক'রে চ'লে গেলেন ভক্তরা যে-যার কাজে। এদিকে দিনের-পর-দিন অনাহারে, বেচারী হরিদাসের অবস্থাটা হয়ে উঠেছে সঙ্গীন! কাজেই অন্য কোন আর উপায় না দেখে, চেপে ধরলেন সকলে এবারে পরমানন্দ

১ শ্রীরামকৃষ্ণ আরত্রিক স্তোত্র—স্বামী বিবেকানন্দ।

পুরীকেই। গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করতেন মহাপ্রভু পুরীজীকে। তাই সকলের আশা ছিল, যদি-বা তাঁর কথাতে কিছু কাজ হয়! কিন্তু না, যথাযোগ্য সম্মান ও মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথাগুলো শুনে নিয়ে বিনীতভাবে বললেন তাকেও প্রভু—

সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি॥
মোরে আজ্ঞা দাও, মুঞি যাঙ আলালনাথ।
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ॥

এবং তারপর, উত্তরের কোন আর অপেক্ষা না করেই, সেবক গোবিন্দকে ডেকে নিয়ে ও পুরীজীকে প্রণাম জানিয়ে, বেরিয়ে পড়লেন একেবারে সদর রাস্তায়। রকম দেখে গোসাঁইজী তো হতভম্ব! অনুনয়-বিনয় ক'রে কোনমতে প্রভুকে ঘরে ফিরিয়ে এনে, বাঁচলেন যেন তিনি হাঁফ ছেড়ে!

অগত্যা সকলে মিলে হরিদাসের কাছে গিয়ে, অনেক ক'রে তাঁকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করালেন অন্নজল গ্রহণ করতে। সকলেই এঁরা ভেবেছিলেন, কিছুদিন আর এভাবে যেতে-না যেতেই, আপনা থেকেই মহাপ্রভুর মন প্রসন্ন হয়ে উঠবে ও আগের মতোই আবারও হরিদাসের সাথে তাঁর মিলন ঘটবে। কিন্তু একী! একদিন একদিন ক'রে একটা বছর কেটে গেল, তবুও প্রভুর দিক থেকে কোন সাড়াশব্দই নেই। রকম দেখে ভক্তেরা তো ভয়ে অস্থির!

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপনেও ছাড়িল সবে স্ত্রীসম্ভাষণে॥

আর হরিদাস? এক বছর ধ'রে অপেক্ষা ক'রে-ক'রেও কোন ফল হ'লনা দেখে, কাউকেই কিছু আর না ব'লে, মনের খেদে একদিন শেষ রাত্রিতে বিছানা ছেড়ে উঠে মনে-মনে মহাপ্রভুকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি চিরদিনের মতোই নীলাচল ছেড়ে।

কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন ভক্তদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু—'হরিদাস কাহা? তারে আনহ এখানে'। কিন্তু কোথায় আর হরিদাস? অগত্যা বললেন তাঁরা, যা তাঁরা জানতেন—অর্থাৎ, কাউকে কিছু না ব'লে হরিদাসের নীলাচল ছেড়ে চ'লে যাওয়ার কথাটাই। সব শুনে, শুধু একটু মুচকি হেসেই চুপ ক'রে রইলেন প্রভু। কতদিন পরে, নবদ্বীপ থেকে শ্রীবাস ও আর-আর ভক্তেরা নীলাচলে এসে পৌছে যখন জানতে চেয়েছিলেন হরিদাসের কথা, তখনও তাঁকে তার উত্তরে কেবল—'স্বকর্ম্মফলভুক্‌পুমান্' অর্থাৎ যার যেমন কর্ম, সে তেমনি ফল-ভোগ ক'রে থাকে—এই একটিমাত্র কথা ব'লেই চুপ ক'রে যেতে দেখা যায়।

ছোট্ট এই কথাটি থেকে আর যা কিছু মনে করা যাক্ বা না-যাক্, এটা কিন্তু বেশ সুস্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ছোট হরিদাসের ব্যাপারে যা ঘটা উচিত ছিল তাই-ই যে ঘ'টেছে, সে-বিষয়ে মহাপ্রভুর মনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বা সন্দেহ ছিল না। এর-পরেও, যখন এই প্রসঙ্গে শুনিয়েছিলেন তাঁকে গৌড়ের ভক্তরা হরিদাসের প্রয়াগে দেহত্যাগের খবরটা (যা তাঁরা শুনে এসেছিলেন প্রয়াগেরই জনৈক বৈষ্ণবের মুখ থেকে) তখনও, কি আশ্চর্য ! এতে ক'রে এতটুকুও বিচলিত বা দুঃখিত না হ'য়ে (বলছেন যেমন চরিতকার) --

শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত।
'প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত' ॥

কাজেই এসব দেখেশুনে, এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ব-অনুমান যে মিথ্যা নয়, সে-কথাটা বোধ হয় এখন আরো জোর ক'রেই বলতে পারা যায়।

(২)

যাহোক, এপর্যন্ত যতটুকু যা আলোচনা করা হয়েছে তা সত্বেও, হয়তো-বা প্রশ্ন উঠতে পারে—কেনই-বা এক্ষেত্রে এতটা নির্দয়তা, এতো বেশী-বেশী কঠোরতা ? হরিদাসের অপরাধটা বস্তুতঃ কী বা কতটুকু ? এবং তৃতীয়তঃ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এই যে কঠোরতম নিষেধ, কোন যুগে বা কোন ব্যক্তির পক্ষেই কি তা ঠিক-ঠিক পালন করা সম্ভবপর ? এসবের উত্তরে আগে যা কিছু বলা হয়েছে তাছাড়াও বলতে হয়—আদর্শ-সন্ন্যাসীর পক্ষে কায়মনোবাক্যে স্ত্রী-সংস্পর্শ ত্যাগের উপরে কেবল মহাপ্রভুকেই নয়, সকল ধর্মাচার্যগণকেই যুগে-যুগে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুনা যায়।[২] এই ছিদ্রপথেই অতর্কিতে জল ঢুকে, সকল কালেই অনেক বড়-বড় জাহাজকেও অতলে তলিয়ে যেতে দেখা যায় ! তারপর, যে কারণেই হোক, চৈতন্যপূর্ব-যুগে এ বিষয়ে যে বেশ-কিছুটা শৈথিল্য এসে প'ড়েছিল, একথাটাও বোধ হয় কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। কাজেই, যা তে আপন শিষ্যদের মধ্যেও এবিষয়ে কোন ভুল বোঝাবুঝি বা দুর্বলতার প্রশ্রয় না ঘটে,

২। "সাধনের সময় মেয়েদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে নেই।...শেষের কথা মাতৃভাব। সাধনার শেষে তাঁর দর্শন হলে, সকলকে মাতৃভাবে দেখে— 'যাদেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা' (চণ্ডী)। গোড়া থেকেই যদি কেউ 'বলে আমার মাতৃভাব, তাদের (মেয়েদের) সঙ্গে মিশলেই বা ক্ষতি কি ?'—তাহলে নিজেই ঠক্‌বে। যারা ঠাকুরের কথা শুনবে না, তারা তার ফল পাবে।"

—(শ্রীমকথা : ১ম খণ্ড)।

তাই-ই মনে হয়, ছোট হরিদাসকে উপলক্ষ্য ক'রে দেখাতে হ'য়েছিল মহাপ্রভুকে এবিষয়ে এতো নির্দয়—এতো কঠোর ভাব। এছাড়াও ভাববার কথা, মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের যে-ধারণা—যে-ভয়—যে-দৃষ্টিভঙ্গী, কোন একজন দেহাত্মবুদ্ধিহীন মহাপুরুষের কাছে তা কখনও একরূপ হ'তে পারে না। এবারে হরিদাসের প্রকৃত অপরাধের কথায় মনে হয়, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাপ্রভুর যে-নিষেধাজ্ঞা, হরিদাসের কাছে তা কখনই অজানা থাকতে পারে না। তাই এক্ষেত্রে বৈরাগী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রকৃতি সম্ভাষণই যে একমাত্র অপরাধ হ'য়েছিল তা নয়, ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুর আদেশ বা নির্দেশ লঙ্ঘনই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল গুরুতর অপরাধ। একথা সহজেই মনে করা যায় যে, অজ্ঞানতা বা অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যই যদি ব্যাপারটা ঘ'টে থাকতো, তাহলে মহাপ্রভুর দিক থেকে একটুখানি মৃদু-তিরস্কার অথবা সস্নেহ ভর্ৎসনাতেই ওর মীমাংসা হ'য়ে যেতে পারতো। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষণীয়—ভক্তদের অনুরোধে দীর্ঘ এক বৎসর ধ'রে নীলাচলে বসেই হরিদাস মহাপ্রভুর আহ্বানের প্রতীক্ষা কচ্ছিলেন। কিন্তু কই! এর মধ্যে একদিনের জন্যও তো তাঁর মনে, সকল অহংকার-অভিমান বিসর্জন দিয়ে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে মহাপ্রভুর চরণতলে লুটিয়ে পড়বার মতো সাধ জাগেনি! তাহলে হয়তো ব্যাপারটির একটু অন্যভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটতো। এবারে তৃতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলা যায়—পাকা সোনায় গড়ন হয় না সত্য। কিন্তু পাকা সোনার কষ না থাকলে, গিনি সোনারও তো কদর করা যায় না। তাই মহাপ্রভুর এই চরমাদর্শ যদি-বা এযুগে কোন ক্ষেত্রে সর্বতো-ভাবে পালন করা সম্ভবপর নাও হ'য়ে ওঠে, তবুও কিন্তু একে শ্রদ্ধার সাথে সামনে রেখে সাধনপথে—ত্যাগের পথে—সন্ন্যাসের পথে চলতে পারলে, এ দ্বারা শুধু যে অনর্থনিবৃত্তিই হ'তে পারে এমন নয়, এতে ক'রে অভীষ্ট-পূরণেরও যে যথেষ্ট সহায়তা হ'তে পারে, একথাটাও কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না।

তবে এই প্রসঙ্গে এটাও ব'লে রাখতে হয় যে, ছোট হরিদাসের ঘটনা দেখে যদি কারও ধারণা জন্মে যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মহাপ্রভুর কোনরূপ হীনতাবোধ ছিল, তবে সে-ধারণাকে সম্পূর্ণ অমূলকই বলতে হবে। মহত্তর কর্তব্যের আহ্বানে মাতা ও স্ত্রীকে ত্যাগ ক'রে, যৌবনের প্রারম্ভেই সন্ন্যাস নিয়ে সংসার ছেড়ে চ'লে গেলেও, আজীবন তাঁদের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণ করতে কোনদিনই তিনি আদৌ কুণ্ঠিত হননি। নিজ মায়ের প্রতি ছিল তাঁর অতুলনীয় ভক্তি। ভক্তিমতী স্ত্রীলোক মাত্রকেই দেখতেন তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে। তাঁর স্ত্রী-ভক্তদের মধ্যে যে-মাধবীদেবীর কাছ থেকে চাল চেয়ে আনায়

ব্যাপার নিয়ে ঘটেছিল এতসব কাণ্ড, তাঁকে গণ্য করতেন তিনি 'শ্রীরাধিকারগণ' ব'লেই। তাঁর 'সাড়ে তিনজন ভক্তের' মধ্যে এঁরও স্থান ছিল, স্ত্রীলোক হিসেবে 'অর্ধজন' রূপে। বস্তুতঃ যিনি সর্বভূতেই দর্শন করতেন সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকেই, তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না স্ত্রী-পুরুষে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি করা। এ সত্ত্বেও যদি তাঁর আচরণের মধ্যে কোথায়ও কোন বৈষম্যমূলক ভাবের আভাস পাওয়া যায়, তবে তাকে দেশকালপাত্রভেদে অপরিপক্ক শিষ্য বা সাধকগণের আত্যন্তিক মঙ্গলকামনায় প্রদর্শিত ব্যবহারিক ভাবেরই সাময়িক প্রকাশ ব'লেই ধ'রে নিতে হবে। ছোট হরিদাসের ব্যাপারে মহাপ্রভুর এইযে কঠোরতম আচরণ, এর সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণেরই উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্তরূপে অন্ত্যলীলা ৫ম পরিচ্ছেদ থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে রায় রামানন্দের নিজ হাতে জগন্নাথদেবের দেবদাসীদের অঙ্গসজ্জা করানো ও শিক্ষাদান সম্পর্কে মহাপ্রভুর যে-সব অনন্যসুলভ উক্তি, যেমন—

রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন।
কহিবার কথা নহে, আশ্চর্য্য কথন॥
এক দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি॥
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তার দর্শন-স্পর্শন॥
তভু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দ মন।
নানা ভাবোদ্‌গম তায় করায় শিক্ষণ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠপাষাণ সম।
আশ্চর্য্য, তরুণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥

তুলনামূলকভাবে ছোট হরিদাসের ব্যাপারে আলোকপাতের জন্যই কেবল নয়, রায় রামানন্দের মতো উচ্চকোটি ভক্ত বা শিষ্যদের সম্বন্ধে মহাপ্রভুর যে-ধারণা ও তাঁদের প্রতি ব্যবহারের অন্যতম নিদর্শনরূপেও কথাগুলোর এখানে উল্লেখ করা গেল।

(৩)

অন্য একটি কথাও এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। চৈতন্যচরিতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী নিজে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন বা সঙ্গলাভের কোন সুযোগই পাননি।

শ্রীক্ষেত্রে তাঁর তিরোধানের বহু বৎসর পরে, বৃন্দাবনধামে শ্রীরূপ ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখে তাঁর লীলাকাহিনী শুনে এবং ওর স্থানবিশেষের জন্য প্রয়াত স্বরূপ দামোদরের কড়চার উপরে নির্ভর করে, আপন কল্পনার সাহায্যেই তাঁকে রচনা করতে হ'য়েছিল চৈতন্যচরিতামৃতের মতো বিশাল গ্রন্থখানি। এরপর, আলোচ্য ছোট হরিদাস প্রসঙ্গে দেখা যায়, শ্রীচৈতন্যদেব নিজে এ বিষয়ে ভক্তদের সাথে কোথায়ও কোন বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা করেননি ; অন্যপক্ষে ভক্তরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে বেশীকিছু জানতে চাইতেও সাহসী হননি। কাজেই এব্যাপারে যে-যৎসামান্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হ'য়েছিল, কেবল তারই ভিত্তিতে গ্রন্থকারের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী নিতান্ত সংক্ষিপ্তাকারেই রচিত হয়েছিল ছোট হরিদাসের সাথে মহাপ্রভুর এহেন দুর্বোধ্য লীলাকাহিনীটি। এবিষয়ে সমগ্র তথ্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ পরিচয় অবগত হওয়া সম্ভবপর হ'লে, ছবিটি অবশ্য কী যে দাঁড়াতো, তা আজ প্রায় পাঁচশো বছর পরে অনুমান করতে যাওয়াটাকেও একে-বারেই একটা অবান্তর ব্যাপার ব'লেই মনে করতে হয়। অগত্যা, উপস্থাপিত তথ্য বা তত্ত্বের ভিত্তিতেই যিনি যেমনভাবে ব্যাপারটিকে ভাবতে বা বুঝতে চান, তাঁর পক্ষে সেই ভাবেই শ্রদ্ধার সাথে এটিকে গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তরই বা কী আর থাকতে পারে? এই প্রসঙ্গে অন্ত্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে চরিত-কারের যে বক্তব্য বা মন্তব্য, তাতে স্বয়ং চরিতকারকেও প্রকারান্তরে এই একই কথাই বলতে শুনা যায়—

মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্রগম্ভীর।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর॥
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত॥

(৪)

যাহোক এইভাবে কেবল অন্যকেই নীতিশিক্ষা বা নৈতিক শাস্তি দিয়েই ক্ষান্ত না হ'য়ে, নিজে মহাপ্রভুও যে সে-শিক্ষাগ্রহণে কতটা তৎপর ছিলেন, তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ছোট হরিদাসের এই ঘটনাটির ঠিক পরের অন্য একটি ঘটনাতেই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথায়—

পুরুষোত্তমে এক ব্রাহ্মণকুমার।
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদুব্যবহার॥

প্রভুস্থানে নিত্য আইসে, করে নমস্কার।

*   *   *

প্রভুতে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে॥
দামোদর তারে প্রীতি সহিতে না পারে॥

কিন্তু, কেন?—ক'দিন দেখে-দেখে, অবশেষে একদিন নিজমুখেই কারণটা ব'লে ফেললেন দামোদর পণ্ডিত প্রভুকে—

পণ্ডিত হঞা মনে কেন বিচার না কর?
রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর?
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী।
তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী॥
তুমিও পরম যুবা পরম সুন্দর।
লোক কাণাকাণি বাতে [কেন] দেহ অবসর॥

আভাসেই পণ্ডিতের বক্তব্য বুঝে নিয়ে, মহাখুশি প্রভু মুহূর্তমধ্যেই সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললেন—

ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ।
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ॥

আর, তারপর ক'দিন যেতে না-যেতেই, এই দামোদর পণ্ডিতকেই ভার দেওয়া হ'ল, নদীয়ায় গিয়ে তাঁর হ'য়ে আজীবন বৃদ্ধা মাতা ও স্ত্রীকে রক্ষণাবেক্ষণের। এই উপলক্ষ্যে সেদিন তাঁকে লক্ষ্য ক'রে যে-কথাক'টি ব'লেছিলেন মহাপ্রভু, তার বুঝি আর তুলনা হয় না :—

তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয়।
আমারে করিলে দণ্ড, আন কেবা হয়॥

কি কথার কী উত্তর! এই হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের চরিত্র—তাঁর শিষ্যব্যবহারের আর এক অভিনব পরিচয়!

শ্রীচৈতন্যদেব

এবারে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব ও কর্মধারা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু একটু আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে।

(১)

জগতে এ-পর্যন্ত যে-সকল অবতার বা অবতারকল্প পুরুষেরা জন্মগ্রহণ করেছেন, শ্রীচৈতন্যদেব যে তাঁদের মধ্যমণিস্বরূপ ছিলেন, একথা বললে বোধহয় কোন অত্যুক্তি করা হয় না। আমাদের ধর্মেতিহাসে এক-একজন অবতারকে নিয়েই করা হয়েছে যুগ-নিরূপণ। যেমন ক'রে আমরা ব'লে এসেছি শ্রীরামচন্দ্রের যুগ—শ্রীকৃষ্ণের যুগ—বুদ্ধের যুগ, তেমনি ক'রেই বলা হ'য়েছে—শ্রীচৈতন্যের যুগও। যুগ-প্রয়োজনেই যুগাবতারগণের আবির্ভাব ঘ'টে থাকে। কাজেই কোন অবতারপুরুষকে বুঝতে গেলে, প্রথমেই প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে তাঁর পূর্ব ও পরবর্তীকালের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার সাথে পরিচিত হওয়ার। দেখা যায়, যে-যুগের যেমন প্রয়োজন, যুগপ্রবর্তক অবতারগণও ঠিক সেইভাবেই আত্মপ্রকাশ করেন। একই চন্দ্রকে তিথিভেদে কখনও এককলা, কখনও-বা পূর্ণচন্দ্ররূপে দেখা যায়। এতে ক'রে চন্দ্রের স্বরূপত্বের কোন হানি হয় না। কেবল আমাদের দৃষ্টিতে—আমাদের পার্থিব বিধিবিধানের দিক থেকেই হ'য়ে থাকে যাকিছু পার্থক্য। তেমনি ক'রেই, আমাদের নিজেদের কাছে যিনি যেমনভাবেই প্রতিভাত হোন্ না কেন, সকল অবতারগণই মূলতঃ বা তত্ত্বতঃ এক ও অভিন্ন। অথবা, শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন বলা হয়েছে—'এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ'—এঁ'রা সকলেই সেই এক অদ্বিতীয় পুরুষেরই প্রকাশবিশেষ। এবিষয়ে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি করলে, সেই মূল অদ্বয় ঈশ্বরতত্ত্বেই ভেদবুদ্ধি করা হয়। কাজেই আমরা যখন শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতারগণের 'মধ্যমণিস্বরূপ' ব'লে বলি, তখন বুঝতে হবে—আমাদের নিজেদের দৃষ্টি বা যুক্তিবুদ্ধি অনুযায়ীই এঁদের প্রকাশের মধ্যে যে তারতম্য দেখা যায়, কেবল সেদিকেই লক্ষ্য রেখে কথাটি বলা হচ্ছে।

এবারে পূর্বোক্ত যুগপ্রয়োজনের কথাতে বলতে হয়—শ্রীরামচন্দ্রের যুগে, আর্যগণের শত্রু যাগযজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষস বা অনার্যগণের নিধন, বর্ণাশ্রমধর্মের সংরক্ষণ ও দাস্যভক্তির প্রবর্তনই ছিল যুগধর্ম-সংস্থাপনের প্রধান লক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণের

যুগে এসে দেখা যায়—সমাজ বহুবিস্তৃত হওয়ার ফলে, সমাজব্যবস্থাও হ'য়ে পড়েছে জটিল। শুধু আর্যঅনার্যভেদই নয়, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ও পরাজিত শূদ্রদের নিয়ে গ'ড়ে উঠেছিল যে-চতুর্বর্ণ, তাতেও ফাটল দেখা দিয়েছে। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে চ'লেছে রেষারেষি, তাঁদের মধ্যেও ঢুকে প'ড়েছে বৈশ্যবৃত্তি। শূদ্রও আর উচ্চবর্ণের কাছে মাথাপেতে থাকতে চাইছেনা। দাবী করতে আরম্ভ ক'রেছে সে'ও, ব্রাহ্মণের বংশগত মর্যাদা, ক্ষত্রিয়ের জন্মগত অধিকার। ধর্ম বলতেও এখন আর কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের অধিকারভুক্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ডকেই বুঝলে চলছেনা। প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে—সমাজসংস্কারের—ধর্মসংস্কারের। যুগপ্রয়োজনে তাই এবারে আবির্ভূত হ'তে দেখা যায় এমন এক সর্বগুণান্বিত মহাশক্তিধর পুরুষের, যিনি ছিলেন একাধারে সর্বধর্মস্বরূপ, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, সমাজতত্ত্ববিদ্, মহাযোদ্ধা, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবান, আবার ভবিষ্যতের'ও দিশারী। ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে মাথায় রেখে, ক্ষত্রিয়শক্তির সাথে হাতমিলিয়ে, স্বীকৃতি দিলেন তিনি আশূদ্র সকলেরই আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকারকে, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে খুলে দিলেন সকলের কাছেই ধর্মের সিংহদ্বার। একদিকে যেমন বলা হ'ল—"মাংহিপার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃপাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তিপরাং গতিম্॥"[১]—অর্থাৎ স্ত্রী-বৈশ্য-শূদ্র অথবা যাদের পাপযোনিসম্ভূত হীনজাতি ব'লে বলা হ'য়ে থাকে, আমার আশ্রয় নিয়ে, সেই তারাও লাভ করবে সেই [একই] পরমগতিই। অন্যদিকেও তেমনি সেই সঙ্গে-সঙ্গেই বলতে শুনা যায়—"কিংপুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তারাজর্ষয়স্তথা"—[অন্যের বেলায় (অর্থাৎ আগে যাদের কথা বলা হ'ল, তাদের ক্ষেত্রে) যদি এরূপ হ'তে পারে, তবে] ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়রাজাদের সম্বন্ধে আর কথা কী ? কিন্তু, শুধু ব্রাহ্মণ হ'লেই চলবেনা, হতে হবে 'পুণ্যবান'. ক্ষত্রিয় রাজা হ'লেই হবে না, হ'তে হবে 'ভক্তিমান রাজর্ষি।'

পূজা বা উপাসনার কথাতেও বলা হ'ল—"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যোমে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"[২]—[শুধু যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, বা যোগমার্গানুসারেই করতে হবে ঈশ্বরসাধন, এমন নয়] ভক্তির সাথে [এমন কী] পত্র-পুষ্প-ফল-জল যাকিছু যে আমাকে অর্পণ করে, আমি সে-সবই [আদরের সাথেই] গ্রহণ ক'রে থাকি। তবে শুদ্ধচিত্তেই প্রদান করতে হবে এইসব ভক্তি-উপহার [ব্রাহ্মণাদির হাত দিয়ে যে দিতে হবে, এমন কোন কথা নেই]। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণমুখনিসৃত ভগবদ্গীতার এইসব কথার উল্লেখ

১ গীতা ৯।৩২ ২ গীতা ৯।২৬

করতে গিয়ে এও বলতে হয় যে, কৃষ্ণকে অবতার ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়ার উপরেই কেবল নির্ভর কচ্ছিল এই যে-সব বিধিবিধান, এবং এদের সার্থকতা বা কার্যকারিতাও। আর, একথাটাও মনে করা কিছু অস্বাভাবিক নয় যে, যুগান্তকারী কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ যাই হোক না কেন, মূল উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণদ্বেষীগণের বিনাশ ও গীতোক্তধর্মমত ও পথের প্রবর্তন। এসত্ত্বেও কিন্তু দেখা যায়, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আগে ও পরে ভীষ্মাদির ন্যায় অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকে অবতার ব'লে স্বীকার ক'রে নিলেও, কৃষ্ণলীলার অবসানকাল পর্যন্তও জনসমাজে তাঁর অবতারত্ব প্রতিষ্ঠালাভ ক'রে উঠতে পারেনি; এবং গীতোক্ত ধর্মমত ও পথও নীতিগতভাবে সর্বত্র স্বীকৃতিলাভ এবং চিন্তাজগতে অনেক মৌলিক ভাবধারার সৃষ্টি করলেও, প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কোনরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়নি।

এথেকে প্রায় দু'আড়াই হাজার বছর পরে এল বৌদ্ধযুগ। চেষ্টা করলেন বুদ্ধ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও পৌরহিত্যপ্রথার উচ্ছেদ করতে। হিন্দুর পৌরাণিক দেবদেবী, পূজাপাঠ, বর্ণভেদ,—এমনকি আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসারও কোন স্থান হ'লনা বুদ্ধের ধর্মমত ও পথের মধ্যে।[৩] অনাত্মবাদ (হয়তো-বা যাকে প্রকৃত-পক্ষে অজ্ঞেয়বাদ বলাই উচিৎ), নীতিবাদ, আসক্তিত্যাগ, ও অহিংসার উপরেই ভিত্তি ক'রে গ'ড়ে তুললেন বুদ্ধ তাঁর নতুন ধর্মসৌধ। জাতিবর্ণ, এমনকি কোনরূপ রুচি ও অধিকারভেদ পর্যন্তও গ্রাহ্য না ক'রেই ডাক দিলেন তিনি সকলকেই তাঁর নতুন ধর্মের পতাকাতলে। কেবল চরিত্রবল ও হৃদয়বত্তার জোরেই, বেদ না মেনেও, কালক্রমে একদিন স্বীকৃতি পেলেন বুদ্ধ হিন্দুধর্ম ও সমাজের কাছে বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে! বুদ্ধের পরে, তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের কাল পর্যন্ত

(৩) এইভাবে এখানে প্রচলিত পৌরাণিক মতানুযায়াই, বুদ্ধকে কৃষ্ণ তথা গীতাপরবর্তী ব'লে বলা হলেও, পণ্ডিত সমাজে কিন্তু এবিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। বুদ্ধ বস্তুতঃ কৃষ্ণ বা গীতার পরবর্তী কিংবা পূর্ববর্তী ছিলেন, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা প্রায় অসাধ্য হ'লেও, গীতা, মহাভারত ও বৌদ্ধ ধর্মপদাদিতে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা থেকে কিন্তু বুদ্ধকে কৃষ্ণ ও গীতার পূর্ববর্তী ব'লে মনে করাটাকেই বেশী যুক্তিসম্মত ব'লে বলতে হয়। এ বিষয়ে 'প্রবর্তক' পত্রিকার ১৩৮৫ কার্তিক ও পৌষ সংখ্যায় লিখিত 'বুদ্ধের আবির্ভাবকাল ও উহার তাৎপর্য' নামে প্রবন্ধটিতে লেখকের নিজস্ব পর্যালোচনার ফলও কিছু-কিছু প্রকাশিত হ'য়েছিল। তবে বুদ্ধ, কৃষ্ণ-পূর্ববর্তী হোন্ বা কৃষ্ণ-পরবর্তীই হোন্, আলোচ্য শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব ও কর্মধারা সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রে, তাতে তেমন কিছু এসে যায় না ব'লেই এখানে সে-সব কথার কোন আর বিস্তারিত উল্লেখ করা হল না।

চলতে থাকল বৌদ্ধধর্ম অপ্রতিহত গতিতে। কঙ্কালসার হিন্দুধর্ম ও সমাজ পেরে উঠলনা তার যৌবনজলতরঙ্গ রোধ করতে। বৌদ্ধসম্রাট অশোকের রাজশক্তির সাহায্যে ভারতেতর দেশেও ছড়িয়ে পড়ল বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু পূর্ব-পূর্ব যুগের সঞ্চিত ধর্মসংস্কারের প্রভাব ও সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের নেতিবাদের ফলে, ব্যর্থ হ'ল বুদ্ধের ধর্ম বেশীদিন ধ'রে এদেশে জনগণের প্রাণমন অধিকার ক'রে থাকতে। জোয়ারের জলে ভেসে গিয়ে, যে-সব নিপীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছিল, ভাটার টানে তাঁরা আবার ফিরে এসে স্থান খুঁজতে লাগল হিন্দুধর্ম ও সমাজে। একদিন যারা ব'লেছিল—'বুদ্ধশরণং গচ্ছামি, ধর্মশরণং গচ্ছামি, সংঘ-শরণং গচ্ছামি'—কারও-কারও মতে, হিন্দুধর্মে ফিরে আসার পরে তারাই নাকি প্রবর্তন করেছিল ত্রিনাথের পূজো ও এম্নি সব আরও কত কী! অপরদিকে, র'য়ে গেল যারা বৌদ্ধমত আকড়ে ধ'রে, তাদের মধ্যেও অনেকেই ভুলে গেল (অথবা প্রথম থেকেই বুঝে উঠতে পারেনি) বুদ্ধের শিক্ষার সারমর্ম। এক রকমের পৌত্তলিকতার বদলে শুরু হ'য়ে গেল আর এক রকমের পৌত্তলিকতা। হিন্দুর দেবদেবীর পরিবর্তে কল্পিত হ'তে লাগল অন্যরকমের নতুন-নতুন দেবদেবী। সৃষ্টি হ'তে থাকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে নানা বামাচারী-কামাচারীর দল!

এর প্রায় হাজার বছর পরে, এলেন এবারে বিষ্ণুর অবতারের বদলে শিবের অবতার—আচার্য শঙ্কর। চেষ্টা করলেন তিনি জ্ঞানের আলো জ্বেলে দিয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার দূর করতে। কিন্তু শিবের জটাজাল-নিবদ্ধা গঙ্গাধারার মতোই এই আলোকধারাও কেবল সমাজের উপরের স্তরেই অবরুদ্ধ রয়ে গেল। থেকে গেল নীচের স্তর যে-তিমিরে, সেই-তিমিরেই! অবস্থা দেখে শেষ পর্যন্ত কঠোর অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকেও লোকহিতার্থে রচনা করতে হ'ল দ্বৈতবাদাত্মক দেবদেবীর স্তোত্রাদি,—দিতে হ'ল পঞ্চযজ্ঞেরও বিধান। শঙ্করযুগের শেষ বরাবর দেশ জুড়ে দেখা দিল এক নতুন মায়াবাদী সন্ন্যাসীর দল। এছাড়া, আচার্য শঙ্কর ও তাঁর শিষ্যগণের কাছে বিচার-বিতর্কে পরাজিত হ'য়ে যে-সব শূন্যবাদী বৌদ্ধপণ্ডিতগণ সমাজঅঙ্গে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলেন, শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে তাঁদেরও ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত কিছু-কিছু প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল। এ ভিন্নও ছিল শ্রুতি-স্মৃতি অনুরাগী সকাম-কর্মনিষ্ঠ সম্প্রদায় ও সেই সঙ্গে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে প্রবল একাধিপত্য। অন্যদিকে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক প্রকাশিত ব্রজের অপার্থিব প্রেমধর্ম বা গোপীপ্রেমও কালক্রমে জনসাধারণের চক্ষে হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল লৌকিক ভাল-বাসারই একটা রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। এমনকি যাঁরা গীতা ও ভাগবতাদিকেই

ধর্মের ভিত্তি ব'লে মেনে নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও এসবের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের ফলে, নানা মত ও পথের সৃষ্টি হ'য়েছিল, যার কথাতেই বলতে শুনা যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও—

পরমকারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে।
স্ব-স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥

এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে, যখন ধর্ম ও সমাজ-সমস্যার কোন অন্ত ছিলনা; পূর্ব-পূর্ব যুগের সমস্ত ধর্মগ্লানিই যেন এসে মিলিত হয়েছিল একই সঙ্গে, আর সেই সাথে যোগ দিয়েছিল নবাগত মুসলমান ধর্মের প্রভাব-প্রতিপত্তি, তার যত কিছু বৈষম্য-বৈপরীত্য নিয়ে, ঠিক সেই মহাসংকট-সময়েই ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব! কাজেই যদি রোগের গুরুত্ব দেখেই ওষুধের সামর্থ নির্ণয় করতে হয়, তবে বলতেই হয়—শ্রীচৈতন্যদেবকে অবতারগণের 'মধ্যমণিস্বরূপ' ব'লে বলায়, আদৌ কোন অতিরঞ্জনের চেষ্টা করা হয় না!

বৈষ্ণবেরা বলেন—পরম উজ্জ্বল শ্রীরাধিকার প্রেমরস আস্বাদনই শ্রীচৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ। কথাটিকে সত্য ব'লে ধ'রে নিলেও, গৌণ কারণ হিসেবেও শ্রীচৈতন্যকে যে-অসাধ্যসাধন করতে হ'য়েছিল, তারও তুলনা মেলা ভার! কৃষ্ণের উত্তরসূরীরূপে, কেবল প্রেমরস-আস্বাদনই নয়, একান্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তাঁকে সুসম্পন্ন করতে হ'য়েছিল তাঁর অনেক আরব্ধ কাজও। কমবেশী চারহাজার বছর আগে[৪] হিন্দুধর্ম ও সমাজক্ষেত্রে বপন ক'রেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ যে-ভক্তিধর্মের বীজ, বৌদ্ধযুগের ঝড়্-ঝাপ্টা ও শঙ্করযুগের শুষ্কতা কাটিয়ে উঠে, শ্রীচৈতন্যযুগে এসেই তা বৃক্ষাকারে পরিণত হ'য়েছিল। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলেই শ্রীচৈতন্যের জন্ম হ'য়েছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও, উচ্চবর্ণের সকল সুখসুবিধা নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে, মিশিয়ে দিয়েছিলেন তিনি নিজেকে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-নির্ধন সকল শ্রেণীর জনগণের সাথেই। ধর্মের জন্য এইভাবে নির্বিচারে সকলের সাথে এক হ'য়ে যাওয়া, হিন্দুধর্মেতিহাসে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবসমাজের এক বিশিষ্ট অবদান! এ ভিন্নও, ধর্মসাধন ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণযুগে যে-ব্যক্তিস্বাধীনতা তত্ত্বতঃ স্বীকৃত হ'য়েছিল, শ্রীচৈতন্যযুগে এসেই তা বস্তুতঃ কার্যকর হয়েছিল। শুধু শিষ্যত্বগ্রহণেরই অধিকার নয়, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল যোগ্য ব্যক্তিকেই এমন কি ধর্মগুরু হওয়ারও অবাধ অধিকার দিয়ে, বলতে শুনা যায় শ্রীচৈতন্যকে—

৪। এখানেও আগের মতোই, কৃষ্ণকে বুদ্ধ-পূর্ববর্তী ব'লে ধ'রে নিয়েই এরূপ বলা হ'ল।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেইজন কৃষ্ণবেত্তা সেই গুরু হয়॥

একেবারেই একটা অভাবনীয় ব্যাপার! আর, এইভাবে কেবল বচনেই নয়, একদিকে রূপ-সনাতন, রঘুনাথ দাস ও অন্যদিকে হরিদাস-ঠাকুর (তথাকথিত 'যবন হরিদাস')-এর ন্যায় ভক্ত বা পার্ষদগণকে দিয়ে বৈষ্ণবমণ্ডলীগঠন ও বৈষ্ণবধর্ম প্রচারণের দ্বারা কার্যতঃ করা হ'য়েছিল এর সার্থক রূপায়ণও। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, পুরানো হিন্দুশাস্ত্র ও শাস্ত্রবিধির উপরেও ছিল তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, সনাতন গোস্বামীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে তাঁর যে উক্তিটি—'সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন'।

(১)

মাত্র ৪৮ বছর মহাপ্রভু দেহধারণ ক'রেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম ২৪ বছর কেটেছিল নদীয়ায়, আর বাকী ২৪ বছরের শেষ ১২ বছর ধ'রে চলেছিল নীলাচলে দিব্যোন্মাদ বা মহাভাবের অবস্থা। কাজেই সন্ন্যাস নেবার পর থেকে মাত্র ১২ বছরের মধ্যেই করতে হ'য়েছিল তাঁকে নদীয়া ছেড়ে নীলাচলে এসে আসনস্থাপন, বৈষ্ণবধর্মপ্রচার, বৈষ্ণবমণ্ডলীগঠন, উপযুক্ত শিক্ষাদানের পর রূপ-সনাতনাদি সংসারত্যাগী শিষ্যগণকে দিয়ে বৃন্দাবন-উদ্ধার ও বৈষ্ণবশাস্ত্রপ্রণয়নের ব্যবস্থা, এবং সেইসঙ্গে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে সংসারী ভক্তদের জন্য গৌড়-দেশে ধর্মপ্রচার ও সঙ্ঘ গঠনের আয়োজন প্রভৃতি যতকিছু ব্যাপারই। এরই এক ফাঁকে দীর্ঘ দু'বছর ধ'রে একরূপ নিঃসঙ্গ হ'য়েই পায়ে হেঁটে ভ্রমণ ক'রেছিলেন তিনি সারা দাক্ষিণাত্য, ও এইভাবে আরও প্রায় চারটি বছর কেটেছিল নীলাচল থেকে গৌড়, বারাণসী, প্রয়াগ ও বৃন্দাবন যাতায়াতে। এছাড়া, যখন যেখানেই থেকেছেন, দিনের-পর-দিন ধ'রেই চলেছে সেখানে অবিরাম ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, ভক্তসমাগম, নানা পার্থিব ও অপার্থিব সমস্যার কথা ও সে-সবের সমাধানের ব্যাপারও। কাজেই এথেকেই মহাপ্রভুর কর্মকুশলতা ও এইকালের কর্মব্যস্ত জীবন সম্বন্ধে অনায়াসেই একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নেওয়া চলতে পারে। কিন্তু এসত্ত্বেও যখন এরপর চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর অন্তলীলার শেষকাণ্ডের ছবিটি[৫], তখন

৫। শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে।
হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে॥
—চৈঃ চঃ মধ্য।

দেখা যায় কোন কর্মই যেন এতদিন ধ'রেও প্রবেশের পথ খুঁজে পায়নি তাঁর অন্তর্লোকের মণিকোঠায়, যেখানে নিত্য নিভৃতে বিরাজিত ছিল রাধাকৃষ্ণের চিন্ময় বিগ্রহ তার আপন মহিমায়। গভীর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও কেমন ক'রে যে থাকতে পারা যায় কর্মশূন্য হ'য়ে, পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের জীবনের মতোই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-জীবনেও পাওয়া যায় তার সুস্পষ্ট নিদর্শন!

এবারে ভেবে দেখা যেতে পারে অন্যদিকের কিছু-একটু কথাও। মাত্র ২৪ বছর বয়সে সতীসাধ্বী যুবতী স্ত্রী, অসহায়া বৃদ্ধামাতা ও পরম অনুরাগী ভক্তদের ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে মহাপ্রভুকে দেশত্যাগী হ'তে দেখে, কারও-কারও মনে হয়তো-বা প্রশ্ন জাগতে পারে—কেন এই সন্ন্যাসগ্রহণ? সংসারে থেকেই কি নিষ্কামভাবে করা যেতে পারতো না যথেষ্ট সাধনভজন—উপযুক্ত ধর্মাচরণ? শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেই এ প্রশ্নের কিছু-কিছু উত্তর পাওয়া যায়। যেদিক দিয়েই হোক না কেন, একথাটা নিঃসংশয়েই বুঝে নিয়েছিলেন মহাপ্রভু,—কেবল নিজের মতো ক'রেই ধর্মসাধন হয়তো-বা সম্ভব হ'তে পারে সংসারে থেকেও, কিন্তু যে-জন্য তাঁর জন্ম, সেই মহাকার্য সাধন করতে হ'লে, শুধু মনেতেই ত্যাগ নয়, ক'রতে হবে তাঁকে বাহ্যত্যাগও; শুধু ঘরে ব'সে ধর্ম করলেই চলবে না, করতে হবে সংসারত্যাগও। নিজে সংসারে থেকে, অন্যকে সংসারত্যাগের উপদেশ দিলে, কেউ-ই তাঁর সে-কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারবে না। বস্তুতঃ, তাঁর সন্ন্যাসজীবনের সংস্পর্শে এসে রূপ-সনাতন ও রঘুনাথদাস-প্রমুখ গৃহত্যাগী ভক্তেরা যে গভীর আত্মত্যাগের প্রেরণা লাভ ক'রেছিলেন, নিজে তিনি সংসার ছেড়ে বেরিয়ে না এলে, তাঁদের প্রাণে সে-প্রেরণা জাগিয়ে তোলা আদৌ সম্ভব হ'য়ে উঠতো কিনা, তা কে জানে? তারপর, তাঁর নিজের যে-কথা—'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখায়'—অর্থাৎ আগে নিজে আচরণ ক'রে দেখাও, তারপর বলো অন্যকে সেরূপ আচরণ করতে—তারও বা লোকে গুরুত্ব দিতো কেমন করে, তাঁর নিজের জীবন—নিজের আচরণ দেখে? দ্বিতীয়তঃ, এটাও অবশ্যই ধ'রে নিতে হয় যে, ভক্তদের কথা ছেড়ে দিলেও, এমন নির্মমভাবে অসহায়া স্ত্রী ও মাকে ত্যাগ ক'রে যে-কাজে তিনি ব্রতী হ'য়েছিলেন, তাঁর মতো কোন একজন কর্তব্যনিষ্ঠ প্রেমিকের পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও তার কথাটা ভুলে থাকা বা সে-বিষয়ে কোনো শৈথিল্য করা কোনমতেই সম্ভব ছিলনা; বরং এই কঠোর ত্যাগের ফলে, দ্রুততর গতিতেই সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য তিনি আরও বেশী-বেশী প্রেরণাই লাভ ক'রেছিলেন। অন্যপক্ষে, যাঁদের ত্যাগ ক'রে তিনি এই মহাব্রত গ্রহণ ক'রেছিলেন, তাঁর প্রতি তাঁদের অকৃত্রিম ভালবাসার গুণে,

তাঁরা নিজেরাও যে ত্যাগের আগুনে পুড়ে-পুড়ে খাঁটি থেকে আরো বেশী খাঁটি হ'য়েছিলেন, একথাটাও তো অস্বীকার করা যায় না। ব্রজগোপীদের শতবর্ষ ধ'রে যে-কৃষ্ণবিরহ, তা তাঁদের কৃষ্ণপ্রেমকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতরই ক'রে তুলেছিল! এছাড়াও, যখন লোককল্যাণের দৃষ্টিতেও দেখা যায় একটি পারিবারিক জীবনের ঐহিক সুখস্বাচ্ছন্দের বিনিময়ে কোটী-কোটী নরনারীকে যুগ-যুগ ধ'রে অপার্থিব সুখশান্তির অধিকারী হ'তে, তখন বলতেই হয় যে, এই শ্রেণীর ত্যাগ বা আত্মসুখ বিসর্জনের সঠিক মূল্যায়ন আদৌ সম্ভব নয়, কখনও—কারও পক্ষেই।

(৩)

এতক্ষণ ধ'রে যে-সব আলোচনা করা হ'ল তাছাড়া অন্যদিক থেকে দেখেও অবাক হ'তে হয় - এতো অল্প বয়সেই মহাপ্রভুর কী অদ্ভুত দূরদৃষ্টি ছিল! এই যে, সন্ন্যাস গ্রহণের পরেই নদীয়া ছেড়ে সোজা নীলাচলে চ'লে যাওয়া, এতেও এই দূরদৃষ্টিরই বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। দেখা যায়, গয়াধাম থেকে ফিরে আসার পরেই তাঁর জীবনপথে বড়রকমের একটা দিক-পরিবর্তন ঘ'টেছিল। ভাল ক'রেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এরপর কী তাঁকে করতে হবে। আর সেইসাথে এও বুঝেছিলেন যে, মুসলমান-শাসনাধীন গৌড় দেশে থেকে, কোন মতেই সম্ভব হ'য়ে উঠবে না সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছান। কাজেই, অন্ততঃ এজন্যও প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল তাঁর পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব গৌড় দেশ ত্যাগ ক'রে গিয়ে কোন একটি সুপ্রাচীন বৈষ্ণবতীর্থে, জনৈক শক্তিশালী ধর্মপরায়ণ হিন্দুরাজার আনুকূল্যে তাঁর প্রথম ধর্মকেন্দ্রটি স্থাপন করা। উড়িষ্যার জগন্নাথক্ষেত্র ও রাজা প্রতাপরুদ্রের নাম তখন কারও অজানা ছিলনা। এ ভিন্ন, নদীয়ার পণ্ডিতসমাজে প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমও কখনও অপরিচিত থাকতে পারেননা। দেখা যায়, সন্ন্যাসগ্রহণের পরেই, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য এরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কিছুমাত্রও তিনি দেরী অথবা ইতস্ততঃ করেননি। আবার, নীলাচলে এসে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দৃষ্টি দিয়েছিলেন তিনি কৃষ্ণ-লীলাস্থল বৃন্দাবন উদ্ধারের দিকে ও সেই উপলক্ষ্যে কালবিলম্ব না ক'রেই সদ্য-সংসারত্যাগী রূপ-সনাতনকে দিয়ে স্থাপন করিয়েছিলেন সেখানে আগামী দিনের স্থায়ী বৈষ্ণবসঙ্ঘের ভিত্তি। একথা তাঁর বুঝতে আদৌ বাকী ছিল না যে, তাঁর অবর্তমানে রূপ-সনাতনাদির নেতৃত্বে বৃন্দাবনই হয়ে দাঁড়াবে নবপ্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র। এর আভাস দিয়ে ব'লেছিলেনও তিনি একদিন

ভাবী সঙ্ঘনেতা সনাতনকে—'কাথা-করঙ্গিয়া মোর কাঁঙ্গাল ভক্তগণ। বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন॥' বস্তুতঃ দেখাও যায়, মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলা সংবরণের কিছু পূর্বে ও পরে-পরেই তাঁর সংসারত্যাগী নীলাচলবাসী পার্ষদগণের মধ্যে একে-একে দেহত্যাগ করেন, হরিদাস, পণ্ডিত গদাধর ও স্বরূপ-দামোদর এবং তারপরেই চিরদিনের মতো নীলাচল ত্যাগ ক'রে, রঘুনাথদাসও বৃন্দাবনবাসী হ'য়ে প'ড়েছিলেন।

এবারে, আগেও একবার যা বলা হ'য়েছিল, সেই কথারই অনুবৃত্তি ক'রে বলতে হয়, ধর্মকর্মের ব্যাপারে কোনরূপ রুচি ও অধিকারভেদ না করার ফলেই যেমন ক'রে একদিন শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটেছিল, তেমনি ক'রেই এবং মূলতঃ সেই একই কারণেই, সাধারণের অনধিগম্য আচার্য শঙ্করের অত্যুচ্চ অদ্বৈতবাদও কালক্রমে অনেক ক্ষেত্রেই কেবল একটা তাত্ত্বিক আলোচনা অথবা শুষ্ক মায়াবাদেই পরিণত হ'য়ে প ড়েছিল। ইতিহাসের এই শিক্ষার ফলেই হোক, কিংবা আপন দূরদর্শিতার গুণেই হোক, আজীবনই কিন্তু এবিষয়ে মহাপ্রভুর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। এরই অন্যতম নিদর্শন হিসেবে, আপন গৃহী ও গৃহত্যাগী ভক্তদের ক্ষেত্রেও ধর্মানুষ্ঠান ব্যাপারে একদিকে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের, ও অন্যদিকে রূপ-সনাতনাদি গোস্বামী-গণের নেতৃত্বে তাঁকে প্রায় প্রথম থেকেই পৃথক-পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্তু হায়! কালের গতি অনিবার্য—অপ্রতিরোধ্য!

(৪)

এরপর এসে পড়ে, শ্রীচৈতন্যজীবনের সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বলা হয়েছে যে-কাজটিকে, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণপ্রেমরস-আস্বাদন অথবা রাধাকৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব-নিরূপণ, তারই কথাটা। যুগ-যুগ ধ'রে এবিষয়ে চ'লে আসছিল যে-ভুলবুঝাবুঝি, তা যেন এতদিনে এসে পৌছেছিল এক চরম পর্যায়ে। জয়দেব-চণ্ডিদাসাদি চৈতন্যপূর্বযুগের বৈষ্ণব কবিদের কাব্যালঙ্কার ও বাচনভঙ্গীর ফলে, কোন-কোন বিরল রসজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বটি অধিকতর উজ্জ্বল অথবা প্রাণস্পর্শী হ'য়ে উঠলেও, সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু সেটি এতদিনে হয়ে দাঁড়িয়েছিল আরও বেশী দুর্বোধ্য। এছাড়াও, এই সব কবি অথবা সাধকগণকে সাধনার অতি উচ্চস্তরে পৌছে, অনেক ক্ষেত্রে ইষ্টের প্রতিরূপজ্ঞানে আপন-আপন ভজন-সঙ্গিনীগণকেই প্রেমনিবেদন করতে দেখে, তত্ত্বজ্ঞানহীন স্থূলবুদ্ধি লোকের মনে, রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় স্ত্রীভূমিকারও একান্ত প্রয়োজন রয়েছে ব'লে একটা ভুল ধারণারই উদ্ভব হ'য়েছিল। শ্রীচৈতন্যের

মতো একজন বিশিষ্ট যুগাচার্যের পক্ষে কোনমতেই এই শোচনীয় পরিস্থিতির কথা অপরিজ্ঞাত থাকা সম্ভব ছিল না।[৬] কাজেই, একথাটা ধ'রে নিয়ে, এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছিতে হয় যে, তাঁর সারাজীবনব্যাপী (বিশেষ ক'রে সন্ন্যাসগ্রহণের পরে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত) কঠোরভাবে স্ত্রীসঙ্গবর্জন ও আপন গৃহত্যাগী সন্তানগণকেও সেইভাবে অনুপ্রাণিত করার মূলে ছিল এই ভুল নিরসনেরই একটা প্রবল প্রয়াস। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, তাঁর ত্যাগী ভক্তগণকে তিনি—স্ত্রীসঙ্গত্যাগের আর কথা কী—স্ত্রীসঙ্গীর-সঙ্গ পর্যন্তও বর্জন করতে উপদেশ দিতেন। এ ব্যাপারে,—'বৈরাগী [হইয়া] করে প্রকৃতি সম্ভাষণ', এই অপরাধে অনুগত ভক্ত হরিদাসকে বর্জন, কারও কাছে মহাপ্রভুর পক্ষে এক অদৃষ্টপূর্ব চরম আদর্শস্থাপন, আবার অন্য কারও মতে 'লঘুপাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থার'ই নিদর্শন হ'য়ে রয়েছে।

কিন্তু কেবল এইরূপ নেতিবাচক শিক্ষাই নয়, অন্তলীলার শেষ ক'বছর ধ'রে আপন শুদ্ধ দেহমনাশ্রয়ে, কখনও মিলন, কখনও-বা বিরহরস আস্বাদন ক'রে-ক'রে, অলৌকিক রাধাকৃষ্ণ-প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধেও যথাসম্ভব চাক্ষুষ ইতিবাচক প্রমাণও দিয়েছিলেন তিনি ভক্তদের কাছে। তাঁর এইকালের শরীর ও মনের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তারই কিছু কিছু উল্লেখ করা গেল—

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে।
আত্মস্ফূর্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে॥
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্তি।
কভু বাহ্যস্ফূর্তি, তিন রীতে প্রভু স্থিতি॥

আবার অন্য সময়ে—

স্বরূপ রামানন্দ দুইজনে লঞা।
বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া॥
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন।
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠার কারণ॥
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ।
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহাকে করিয়া বিলাপ[৭]॥

৬। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা—'গোপীদের যে প্রেম, তার একবিন্দু যদি কারও হয়, তাহলে সে জীবন্মুক্ত হয়ে যায়'।

৭। এত কহি গৌরহরি দুই জনার কণ্ঠে ধরি
কহে 'শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করু কাঁহা যাঙ কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়॥

আবার কখনও-বা—

উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান নৃত্য।
দেহের স্বভাবে করে স্নানভোজন কৃত্য ॥

তবে কেবল শ্রীরাধিকার ভাবই নয়, মহাপ্রভুর চরিত্রে একাধারে রাধাকৃষ্ণ, ভক্ত-ভগবান, উপাস্য-উপাসক ও পুরুষ-প্রকৃতি ভাবেরও ঘটেছিল এক অপূর্ব সমাবেশ। তাই কখনও দেখা যায় তাঁকে 'কৃষ্ণবৎ' আবার পরক্ষণেই 'ভক্তবৎ'।

অন্তলীলায় মহাপ্রভুর এই মহাভাব-প্রসঙ্গে, তাঁর আসন্ন লীলাসংবরণ সম্বন্ধেও দু'চারটি কথার এখানেই উল্লেখ করা হ'ল—

এইরূপ ভাবের আতিশয্যেই তাঁর 'রাধাপ্রেমেগড়াতনু' ক্রমে-ক্রমে সেই ভাবসাগরেই লয়প্রাপ্ত হ'য়ে যেতে দেখা যায়।৮ তবে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে বাকী থাকেনা যে, রূপ-সনাতনকে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবন পাঠানো ও তারপর শ্রীমৎ নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের নেতৃত্বে গৃহস্থ ভক্তদের মধ্যে ধর্মপ্রচারের ব্যবস্থা হ'য়ে যাওয়ার পরেই বস্তুতঃ সূচনা হ'য়ে গিয়েছিল এই লীলাবসানপর্বের। এরপর পরমভক্ত হরিদাসের দেহত্যাগের পর থেকে এর জন্য প্রস্তুতি যেন আরও এক ধাপ এগিয়ে আসে। শেষ বরাবর চোখের জলে নীলাচল থেকে নদীয়ার ভক্তদের বিদায় দিতে গিয়েও যেন সেই আভাসই ফুটে উঠতে দেখা যায় মহাপ্রভুর কথায় ও কাজে। কিন্তু এই বিদায়ের পালা বুঝিবা সেদিন থেকেই আরও বেশী তরান্বিত হ'য়ে উঠেছিল, যেদিন অন্তলীলায় পণ্ডিত জগদানন্দ মারফৎ পৌঁছে গিয়েছিল তাঁর কানে অদ্বৈত-গোসাঁই এর সেই হেঁয়ালিটি—

বাউলকে কহিও লোকে হৈল আউল।
বাউলেরে কহিও হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল ॥

কথাগুলোর অর্থ আর যিনি যাই বুঝে থাকুন না কেন, ওর মধ্যে তাঁর আসন্ন লীলাসংবরণ সম্বন্ধে আচার্য গোসাঁইয়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটি বুঝে নিতে মহাপ্রভুর যে একটুও দেরী হয়নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের কথা থেকেই—

প্রভু কহে 'আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।
আগম শাস্ত্রের বিধিবিধানে কুশল ॥

৮। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি— 'নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রই হ'য়ে গে'ল।'

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।
পূজানির্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন ॥'

কী আশ্চর্য! এই অদ্বৈতাচার্যের কথাতেই বলতে শুনা যায় একদিন চরিতকারকে আদিলীলায়—'অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞিির মহিমা অপার। যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার ॥' অর্থাৎ যাঁর হুঙ্কারেই একদিন 'আবাহন', সেই তাঁকেই এবারে অন্তলীলায় এইভাবে ইঙ্গিত দিতে দেখা যায় বিসর্জনেরও!

(৫)

যাহোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব ও কর্মধারা সম্বন্ধে এইভাবে আরও অনেক কথাই বলতে পারা গেলেও, এরপর কেবল তাঁর দাক্ষিণাত্যভ্রমণের ব্যাপারটি নিয়ে কিছু একটু আলোচনা ক'রেই, এবারের মতো কথা শেষ করতে চেষ্টা করা যাক।

সন্ন্যাসগ্রহণের পরেই নীলাচলে এসে পণ্ডিত সার্বভৌম ও আর আর ভক্তদের সাথে মাসদু'য়েক পরমানন্দে কাটিয়ে, রওনা হ'য়ে পড়লেন মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য অভিমুখে। উপলক্ষ্য হ'ল নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপের সন্ধান। কিন্তু আসল লক্ষ্য যে কী ছিল, তার প্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর ভ্রমণকাহিনীটিতেই। তখনকার দিনে পথ চলতে গিয়ে প্রতি পদে-পদেই ছিল বিপদের ভয়। এছাড়াও ছিল গুরুতর ভাষাগত পার্থক্য। কিন্তু সে-সব কোন বাধাবিপত্তিই গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে, সকলের একান্ত অনুরোধে কেবল সেবক একজন[১] সঙ্গে নিয়েই (বলছেন চরিতকার)—

মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন।
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সংকীর্তন ॥

সিংহই বটে! সিংহরাশি ও সিংহলগ্নেই জন্ম হয়েছিল মহাপ্রভুর। চৈতন্য-

১। আশ্চর্যের কথা 'কালাকৃষ্ণদাস' নামে এই যে ছেলেটি, যার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলায় বলা হ'য়েছে 'গোসাঞিির সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ। ভট্টমারিসহ তার হৈল দরশন॥ স্ত্রীধন দেখাইয়া তাঁর লোভ জন্মাইল। আর্য-সরল বিপ্রের বুদ্ধিনাশ কৈল॥' ও তারপর মহাপ্রভু কর্তৃক তার উদ্ধারের কথায়ও যেমন শুনা যায় 'কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন', সেই তাকেই জনৈক প্রখ্যাত পণ্ডিতকে আপন যুক্তি-বিবেচনা মতোই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ব'লে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী দেখা যায়! এ বিষয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ ও বৈষ্ণব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কাঠিয়াবাবা সম্প্রদায়ের মুখপত্র 'বাসুদেব' পত্রিকার পৌষ ১৩৮৬ সংখ্যায় লেখকের একটি নাতিদীর্ঘ প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় এখানেও কথাটির উল্লেখ করা গেল।

চরিতামৃতের কথায়—

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার ॥

নরসিংহের এই প্রমত্ত হুঙ্কার বা উচ্চসংকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হ'য়ে, চলার পথে প্রতিটি জনপদ—প্রতিটি দেবালয়ে হ'তে দেখা যায় অসংখ্য লোকের ভীড়।

আশ্চর্য্য শুনি সব লোক আইল দেখিবারে।
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈল চমৎকারে ॥
দর্শনে বৈষ্ণব হৈলা বোলে 'কৃষ্ণহরি'।
প্রেমাবেশে নাচে লোক উর্দ্ধবাহু করি।
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম।
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্যসব গ্রাম ॥

এমনি ক'রে হরিনামের বন্যায় সারা দেশ ভাসিয়ে[১০] প্রায় দু'বছর ধ'রে চলেছিল দাক্ষিণাত্যে মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়। এর মধ্যে, আসতে হয়েছিল তাঁকে দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ও অদ্বৈতবাদী নানা ব্যক্তি ও সম্প্রদায় এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধ ও মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণেরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই, আপন অসামান্য প্রতিভা, গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতির ফলে, অন্য সকল বিরুদ্ধ মতই খণ্ডন ক'রে, সহজেই সক্ষম হ'য়েছিলেন তিনি যুগধর্ম বা শুদ্ধাভক্তির মত ও পথের প্রতিষ্ঠা করতে।

সর্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে।
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥
হারি হারি প্রভু মতে করেন প্রবেশ।
এই মতে বৈষ্ণব করিল দক্ষিণ দেশ ॥

ক্ষেত্রবিশেষে আবার সাধকের নিজস্ব সাধন পদ্ধতি দেখে খুশি হ'য়ে, তিনি তা'দিগকে আপন-আপন ভাবেই সাধন পথে এগিয়ে যাওয়ার উৎসাহও দিয়েছিলেন, যেমন দেখা যায় রামভক্ত মুরারী গুপ্তের ক্ষেত্রে ও এই দাক্ষিণাত্যের জঙ্গলে আরও একটি রামোপাসক ব্রাহ্মণের বেলাতেও।

দেখে শুনে বিস্মিত হ'তে হয়, বাহ্যতঃ মাত্র চব্বিশ-পাঁচিশ বছরের ধর্মোন্মাদ যুবক একটি, কী অদ্ভুত বিচক্ষণতার সাথে সারাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে ধর্মীয় ঐতিহ্যের কথাটাও চিন্তা ক'রে সেদিন বেছে নিয়েছিল

১০। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা— 'যখন বান আসে, তখন ডাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল'!

দাক্ষিণাত্যকেই নব-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সব চেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র ব'লে !

লক্ষ্য করার কথা, চলার পথে কেবল বৈষ্ণবতীর্থমাত্রই দেখে ক্ষান্ত না হ'য়ে, যে সব শৈব, শাক্ত ও অন্যান্য তীর্থস্থানও তাঁর চোখে পড়েছিল, ভক্তিভাবে সে-সব দর্শন করতেও মহাপ্রভু আদৌ কুণ্ঠিত হয়নি। আবার বৈষ্ণবভাবে ভাবিত ভক্তের মধ্যেও ভাবের বৈষম্য দেখে, তার যথোচিত সামঞ্জস্য ক'রে দিতেও দেখা যায় তাঁকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, শ্রীরঙ্গমে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক বেঙ্কটভট্টের প্রতি তাঁর উক্তিটি—

কৃষ্ণনারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপীলক্ষ্মী ভেদ নাহি, হয় একরূপ॥[১১]
গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥
একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥

মহাপ্রভুর এই কথাগুলিকে ভিত্তি করে, অনেক আধ্যাত্মিক অথবা অলৌকিক তত্ত্বেরই সুসমাধান করা যেতে পারে। কৃষ্ণের বিগ্রহমূর্তিতে রামভক্তের রামরূপ দর্শন, কিংবা কালামূর্তিতে কৃষ্ণভক্তের কৃষ্ণরূপ দর্শন প্রভৃতি যে-সব তথাকথিত অলৌকিক কাহিনী ভক্তসমাজে প্রচলিত দেখা যায়, এদ্বারা যুক্তিযুক্তভাবে সে সকলেরও সত্যতা বা সম্ভাব্যতাও সমর্থিত হ'তে দেখা যায়। এছাড়াও, যুগোপ-যোগীভাবে মহাপ্রভুকে সর্বসাধারণের জন্য শুদ্ধাভক্তির মত ও পথকেই একমাত্র পথ বলে প্রচার করতে দেখা গেলেও, এ থেকে ধর্মবিষয়ে তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গিরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এবারে, যে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' ক'রে মহাপ্রভুকে এতো পাগল হ'তে দেখা যায়, সেই 'কৃষ্ণ' সম্বন্ধে তাঁর যে-ধারণা, সে-বিষয়েও সংক্ষেপে কিছু-একটু আলোচনা করবার চেষ্টা করা করা যেতে পারে। বারাণসীতে সনাতন গোস্বামীর শিক্ষাপ্রসঙ্গে কোন এক জায়গায় বলতে শুনা যায় মহাপ্রভুকে—

কৃষ্ণের স্বরূপ-বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সর্বআদি সর্বঅংশী কিশোরশেখর।
চিদানন্দদেহ সর্বাশ্রয় সর্বেশ্বর॥

১১। বস্তুতঃ অবতারবাদের এটিই মূলকথা। তুলনীয় শ্রীহনুমানের উক্তি—'শ্রীনাথে জানকী-নাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ।'

এখানে এইভাবে 'কৃষ্ণ' বা 'ব্রজেন্দ্রনন্দনকে' স্বরূপতঃ যে-'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' অন্যকথায় অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ অতএব 'সর্বআদি, সর্বাশ্রয়, চিদানন্দদেহ' ইত্যাদি বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়েই বলা হ'য়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে—'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজজ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি-ভগবানিতিশব্দ্যতে'—তত্ত্ববিদেরা সব রকমেরই ভেদরহিত সেই অদ্বয়জ্ঞানকেই 'তত্ত্ব' ব'লে ব'লে থাকেন। সেই একই তত্ত্বকেই কোথায়ও ব্রহ্ম, কোথায়ও পরমাত্মা, আবার কোথায়ও বা ভগবান ব'লেই বলা হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও বলতে শুনা যায়—'ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা। অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।'—অর্থাৎ সেই এক আত্মতত্ত্বকেই কেউ ধ্যান বা যোগের দ্বারা, কেউ জ্ঞানের দ্বারা, কেউ কর্মের [নিষ্কামকর্মযোগের] দ্বারা, আবার কেউ-বা ভক্তি দ্বারাই [অর্থাৎ অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে জেনে নিয়ে বা তাঁর সাহায্য নিয়ে] লাভ ক'রে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি—তিনি জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান। ঠিক এই একই কথা ব'লেছিলেন মহাপ্রভু নিজেও—'জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনার বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥' কাজেই একথা বলতেই হয় যে, কোন সাধ্য-সাধনতত্ত্ব—কোন সাধনপথই তাঁর অজানা-অচেনা ছিল না।[১২] এ সত্ত্বেও তিনি যে ভক্তিযোগের প্রাধান্য দিয়েছিলেন—নির্দেশ করেছিলেন ভক্তি-পথকেই একমাত্র পথ ব'লে—'কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'- তার কারণ, ভক্তিযোগই এযুগের যুগধর্ম ; যেমন বলতে শুনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণকেও এযুগের যুক্তিবাদী মানুষের কাছে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে—'কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি। শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে, তার সময় কৈ ? আজকালকার জ্বরে দশমূল পাঁচন চলে না। দশমূল পাঁচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হ'য়ে যায়! আজকাল ফিবার-মিক্‌চার।' তবে এইভাবে কেবল এযুগের 'অন্নগতপ্রাণ' মানুষের বেলাতেই-বা কেন ? হাজার-হাজার বছর আগেও সাধনার ক্ষেত্রে এ-সমস্যাটি যে বেশ গুরুতর আকারেই দেখা দিয়েছিল, তার অন্যতম প্রমাণের মধ্যে উল্লেখ্য গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকটিও—'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম।

১২। 'সর্বত্যাগীর জ্ঞান, সূর্যের আলোর ন্যায়। সে আলোতে ঘরের ভিতর বার সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান—জ্ঞানসূর্যের আলো। আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচন্দ্রের শীতল আলোও ছিল। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তিপ্রেম, দুই-ই ছিল।—(শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত —৩য় ভাগ)।

অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥' অব্যক্ত নির্গুণব্রহ্মের সাধকদের বেলায় সিদ্ধিলাভ যে কত কঠিন, দেহাভিমানী জীবের পক্ষে নির্গুণব্রহ্মে অভিনিবেশ যে কত দুঃসাধ্য, তা এইভাবে বিলক্ষণ উপলব্ধি ক'রেই তবে দিতে হ'য়েছিল যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণকেও সেই সে-যুগেও ভক্তিযোগেরই বিধান, বলতে হয়েছিল গীতার এই অধ্যায়েই—'ময্যাবেশ্য মনো যেমাংনিত্যযুক্তাউপাসতে শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥'—[অন্যপক্ষে] যারা আমাতে মন নিবিষ্ট ক'রে, নিত্যযুক্ত হ'য়ে, পরমশ্রদ্ধার সাথে আমার উপাসনা করে, আমার মতে, তারাই হচ্ছে যুক্ততম—অর্থাৎ ঈশ্বরের সাথে সর্বাপেক্ষা বেশী নিবিড়ভাবে যুক্ত। তাই মনে হয়, জ্ঞান পথই হোক—ভক্তি পথই হোক আর অন্য যে-কোন পথই হোক না কেন, আপাত-দৃষ্টিতে তাদের পরস্পরের মধ্যে যে-বিরোধ দেখা যায় সে-সম্বন্ধে অন্য সব কথা ছেড়ে দিয়ে, কেবলমাত্র রুচিভেদ, অধিকারীভেদ, ও যুগপ্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখতে পারলে, অনেক ক্ষেত্রেই একটা সহজ-সরল ও সন্তোষজনক মীমাংসা হ'য়ে যাওয়া কিছু অসম্ভব নয়!

এবারে কৃষ্ণকে এইভাবে 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব' ব'লে বর্ণনা করার তাৎপর্যের কথায় মনেহয়, এদ্বারা মহাপ্রভুকর্তৃকও যে অদ্বৈতবাদ তত্ত্বতঃ স্বীকৃত হয়েছিল, এরূপ মনে করাটা কিছু অযৌক্তিক নয়। তবে অদ্বৈতবাদ নিয়ে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হ'য়েছিল এবং সেই সঙ্গে যুগধর্ম—লোকধর্মরূপে অবতারবাদের প্রতিষ্ঠারও যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, ওরই পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ হয় তাঁকে এখানে এইভাবে কৃষ্ণকেই স্বরূপতঃ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বরূপে ভাবনা করার নির্দেশ দিতে দেখা যায়, যেমন অন্যত্রও তাঁকে বলতে শুনা যায়—'কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা। নরবপু তাঁহারই স্বরূপ।' বস্তুতঃ যেমন দেখা যায় তাতে, বেদান্ত-প্রতিপাদিত অদ্বৈতবাদকে মহাপ্রভু কখনও মিথ্যা ব'লে উপেক্ষা করেন নি।[১৩] অদ্বৈতবাদের ব্যাপারে তাঁর যা কিছু আপত্তি, তা ছিল প্রধানতঃ বিবর্তবাদ বা আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য সম্বন্ধে, যাতে এই জীব-জগৎকে অস্তিত্বহীন, মায়া বা অজ্ঞান কল্পিত স্বপ্নবৎ মিথ্যা ব'লে অভিহিত করা হ'তে দেখা যায়। মহাপ্রভুর মতে জীব-জগৎ মিথ্যা কল্পনা মাত্র নয়। বস্তুতঃ ইহা অনিত্য বা অস্থায়ী।

১৩। তুলনীয়—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যাভিসংবিশন্তিঃ।' (তৈত্তিঃ উপঃ)। 'ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়। সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়' ॥ চৈঃ চঃ মধ্যঃ।

জীবের যে-দেহাত্মবুদ্ধি উহাই কেবল মিথ্যা কল্পনা মাত্র।[১৪] তবে, আচার্য শঙ্করের এই যে ব্যাখ্যা বা ভাষ্য একেও (যে দিক দিয়েই হোক) তাঁকে আচার্যের মাধ্যমে স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাজ ব'লেই গণ্য করতে দেখা যায়।

এরপর ধর্মকর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতার কথাতেও অন্য এক প্রসঙ্গে বলতে শুনা যায় মহাপ্রভুকে—'নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে'। অর্থাৎ নিরপেক্ষ বা পক্ষপাতশূন্য, অন্যকথায় উদার অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজনীন না হ'লে, ধর্মহানি যে অনিবার্য, কথাটিতে সেরূপ ইঙ্গিতই দিতে দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে, জগতের বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায় সেকথা ছেড়ে দিলেও, পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম ও সমাজে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবকে নিয়েই যে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা যায়, তার পরিপেক্ষিতেও মহাপ্রভুর উক্ত উক্তিটি, ও সেই সঙ্গে এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের স্থান বিশেষেও যেমন বলতে শুনা যায়—

তেঁহো ব্রহ্মা হৈঞা সৃষ্টি করিল সৃজন।
বিষ্ণুরূপ হৈঞা করে জগতপালন॥
রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎসংহার।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় [হয়] ইচ্ছায় যাঁহার॥

সে-সবকে একত্র-ক'রে দেখলে, বুঝা কঠিন হ'য়ে পড়ে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিব-ভক্তদের মধ্যে এই জাতীয় যে-বিবাদ, মতভেদ বা গোঁড়ামী, তা বস্তুতঃ অবকাশ কোথায়?

যাহোক এই তত্ত্বকথা প্রসঙ্গে আবারও একবার স্মরণীয়, এই দাক্ষিণাত্যভ্রমণ উপলক্ষ্যেই গোদাবরীতীরে রায় রামানন্দের সাথে মহাপ্রভুর আলোচনা প্রসঙ্গটি। দেখা যায়, মনের মতো শ্রোতা পেয়ে, ভাবের প্রেরণায় একের পর এক শাস্ত্র থেকে শুরু ক'রে মধুরভাবের কথা অবধি শোনাবার পরেও যখন আবারও—

প্রভু কহে 'এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয়'॥

তখন আর সম্ভব হ'য়ে উঠেছিল না সেদিন রায় রামানন্দের পক্ষে বিস্ময় চেপে রাখা!

রায় কহে 'ইহার আগে পুছে হেন জনে।
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে॥'

এইভাবে দশরাত্রি ধ'রে আলোচনার শেষে দেখিয়েছিলেন প্রভু রায় রামানন্দকে

১৪। 'জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়। জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র কয়।'—চৈঃ চঃ মধ্যঃ।

তাঁর 'রসরাজ-মহাভাব' অর্থাৎ একাধারে রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্তি ও তারপর তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে, পরদিন সকাল হ'তে-না-হ'তেই আবারও বেরিয়ে পড়েছিলেন তীর্থপরিক্রমায়।

এবারে আবার আগের কথায় ফিরে গিয়ে দেখা যায়—জগন্নাথ ক্ষেত্র থেকে সমুদ্রতীরের পথ ধ'রে আলালনাথ পৌঁছে, নীলাচলের সকল ভক্তদেরই বিদায় দিয়ে ক্রমে-ক্রমে এসে পৌঁছেছেন প্রভু কূর্মগ্রামে। কূর্মের সেবক বৈদিক ব্রাহ্মণ অনেক শ্রদ্ধাভক্তি জানিয়ে ভিক্ষাগ্রহণ করালেন তাঁকে তাঁর নিজের বাড়ীতে ও তারপর ধ'রে বসলেন, সংসার ত্যাগ করিয়ে নিয়ে যেতেই হবে তাঁকে সাথে ক'রে। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ীতেই থাকতে রাজী করিয়ে, বললেন তাঁকে প্রভু—

যারে দেখ তারে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

কথা কানে হাঁটে! লোকের মুখে মহাপ্রভুর খবর শুনে, সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ বাসুদেব নামে ব্রাহ্মণ একজন এসে উপস্থিত পরদিন সকালে কূর্মের মন্দিরে। কিন্তু এলে কী হবে? যাঁর জন্য আসা, তিনি যে ততক্ষণে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন! 'হায়'! 'হায়'! ক'রে কাঁদতে লাগলেন বাসুদেব। এদিকে, কী আশ্চর্য! কিছুক্ষণ যেতে-না-যেতেই দেখা গেল, পথ থেকে ফিরে আবারও এসে প'ড়েছেন প্রভু কূর্মের মন্দিরে। বাসুদেবকে দেখামাত্রই করলেন তিনি তাঁকে আলিঙ্গন। তারপর (বলছেন চরিতকার)

প্রভুস্পর্শে দুঃখসঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল।
আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল॥
প্রভুর কৃপা দেখি তার বিস্ময় হৈল মন।
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন॥

দেখে-শুনে মনে হয়, কুষ্ঠ দূর হ'তে দেখে (যদি কিনা কথাটিকে আক্ষরিক অর্থেই নিতে হয়) যত না আনন্দ হ'য়েছিল বাসুদেবের, তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছিলেন তিনি মহাপ্রভুর দর্শন—তাঁর অহেতুক কৃপার স্পর্শ পেয়ে। কিন্তু, একী করলেন প্রভু! ব'লে ওঠেন বাসুদেব—

কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হৈয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥

এ যে কেবল একটা কথার-কথাই নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর নিজের কাজ দেখেই—

সর্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ সেহো কীড়াময় ।
অঙ্গহৈতে সেই কীড়া খসিয়া পড়য় ॥

কিন্তু খ'সে পড়লেও ছাড়া ছিল না ! আবারও,

'উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয় ।'

বাসুদেবের কথা শুনে, তাঁর ভাব দেখে, প্রাণখুলে অভয় দিয়ে—

প্রভু কহে 'কভু তোমার না হবে অভিমান ।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ-কৃষ্ণ' নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥

অবাক হয়ে ভাবতে হয়—কোথায় ছিল এতদিন কূর্মের পূজারী এই অজ্ঞাত অখ্যাত ব্রাহ্মণটি ? কেই-ই বা কবে এতটুকুও শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে এই অস্পৃশ্য কুষ্ঠরোগী বাসুদেবকে ? কে-ই বা জান্‌তো এর আগে, কী গভীর ঈশ্বরপ্রীতি ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ভাব লুকিয়ে ছিল এতদিন ধ'রে এঁর অন্তরের অন্তরে ? তাই কি ভগবানের এক নাম 'অন্তর্যামী' ? অর্থাৎ তিনি যে কেবল হৃদয়ে বাসই করেন তাই নয়, জান্‌তে পারেন অন্তরের প্রতিটি গোপন কথাও ! অন্যদিক দিয়ে আবার এও মনে হয়, - এমন যে বাসুদেব, তাঁকেই যদি 'অহংকার-অভিমান নাশের জন্য, দিতে হ'য়ে থাকে মহাপ্রভুকে এইভাবে নিরন্তর কৃষ্ণনামের বিধান' তবে আর অন্যের সম্বন্ধে কথা কী ?

এরপর শ্রীরঙ্গমের একটি ভক্তের কথা। এঁর সাথে দেখা হ'য়েছিল মহাপ্রভুর রঙ্গনাথের মন্দিরে। ছিলনা এঁর আদৌ কোন পাণ্ডিত্য, এমনকি ভাষাজ্ঞান পর্যন্তও না। তবুও কিন্তু মন্দিরপ্রাঙ্গণে ব'সে, দিনের পর দিন ধ'রে মনের আনন্দে নিত্য-নিয়মিত পাঠ ক'রে যান তিনি গীতার এক থেকে আঠারো অধ্যায় পর্যন্ত। তাঁর অশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে, ভাবভঙ্গি দেখে, চ'লে যায় কেউ মুচকী হেসে, কেউ-বা করতে থাকে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ। কিন্তু কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপমাত্র না ক'রে, আবিষ্ট হ'য়েই চালিয়ে যেতে থাকেন তিনি তাঁর গীতাপাঠ, আর শরীরে দেখা দিতে থাকে—পুলক, অশ্রু, স্বেদ, কম্প ! ব্যাপারটা চোখে পড়তেই, বেশ একটু কৌতূহলী হ'য়েই—

মহাপ্রভু পুছিল তারে 'শুন মহাশয় ।
কোন অর্থ জানি তোমার এতসুখ হয় ?'

উত্তরে জানালেন ব্রাহ্মণটি বিনীতভাবে, কোন শব্দেরই তিনি অর্থবোধ করতে

পারেন না, কেবল গুরুর আদেশমতোই ক'রে যান গীতাপাঠ। তবে, যতক্ষণ ধরে চলতে থাকে এই পাঠ, ততক্ষণই চোখের সামনে স্পষ্ট দেখ্‌তে পান তিনি অর্জুনের রথে 'শ্যামল-সুন্দর' শ্রীকৃষ্ণকে, আর সেই আনন্দের লোভেই, চায় না তাঁর মন গীতাপাঠ ত্যাগ করতে। ব্রাহ্মণটির কথা শুনে পরম আনন্দে (চরিতকারের কথায়)—

প্রভু কহে 'গীতাপাঠে তোমারই অধিকার।
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থসার ॥'[৫]

বল্‌তে-বল্‌তে, মহাপ্রভু ব্রাহ্মণটিকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন, আর তিনিও তাঁর পা-দুটি জড়িয়ে ধ'রে, তাঁকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবোধেই শুরু ক'রে দিলেন সেকি কান্না! তা এতে আর তেমন বিস্মিত হবার মতোই বা কী ছিল? কতদিন ধ'রেই তো কত জ্ঞানী-গুণীরই আসা-যাওয়া চলছিল এই রঙ্গনাথজীর মন্দিরে; কিন্তু কই! কেউ-ই তো কখনও একবারও ফিরে তাকাননি এই সহজ-সরল ব্রাহ্মণটির দিকে! কেউ-ই তো কখনও তার ভাবভঙ্গিতে আকৃষ্ট হ'য়ে, এমন ক'রে একবারও জান্‌তে চাননি তার মনের—তার প্রাণের গোপন কথাটি! আর, মুখফুটে সে কথাটা বলতে গেলেও, মহাপ্রভুর মতো এমন ক'রে তার কদরই বা করতে পারতেন কে?

যাহোক এরপর পাণ্ডুপুরে এসে শ্রীমৎ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর সাথে দেখা হ'তে, জানতে পেরেছিলেন মহাপ্রভু নিজ জেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বরূপের 'শঙ্করারণ্য' ব'লে সন্ন্যাসনামগ্রহণ ও পরে দেহত্যাগের খবরটিও।

ভক্তের কথাই ভগবানের কথা! ভক্তের কাহিনীই ভগবানের কাহিনী! তাই এরপর আর একটি ভক্তের সাথে মিলনের কথাটার উল্লেখ করেই, মহাপ্রভুর এই দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ বৃত্তান্তটি শেষ করছি। শ্রীরঙ্গম থেকে ঋষভপর্বত, শ্রীশৈল ও কামকোষ্ঠি হ'য়ে, এসে পৌছেছেন প্রভু দক্ষিণমথুরার এক জঙ্গলে। পৌছিবার

১৫। লক্ষ্য করার কথা—ভাক্তবাদের দৃষ্টিকোণ থেকেই, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরের সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপত্বের মধ্যে এখানে 'আনন্দাংশকেই' গীতার 'অর্থসার' কিনা 'সারাংশ' বা মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় ব'লেই বলা হতে দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে উল্লেখ্য শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটি—'বারবার 'গীতা' বলতে বলতে 'তাগী' (ত্যাগী) হয়।' অর্থাৎ 'ত্যাগ'ই গীতার কথার সারমর্ম। বলাবাহুল্য, এখানে ঈশ্বরের 'চিদাংশ'কেই প্রকারান্তরে গীতার সারাংশ 'অর্থসার' বা মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় বলেই বলতে শুনা যায়।

তবে কথা এই—'অমৃত-সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে-কোন প্রকারেই হোক এ-সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল।... .অনন্ত পথ— তার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি— যে-পথ দিয়েই যাও, আন্তরিক হ'লেই [সচ্চিদানন্দস্বরূপ] ঈশ্বরকে পাবে।—কথামৃত: ১ম ভাগ।

পরেই, সেই যে রামভক্ত ব্রাহ্মণটি, যার কথার উল্লেখ করা হ'য়েছিল আগেও অন্য এক প্রসঙ্গে, তাঁর সাথে হঠাৎ দেখা হ'য়ে যেতেই, সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন তিনি প্রভুকে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য। প্রভুও সময় মতো নদীতে স্নান সেরে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন ব্রাহ্মণের কুটিরে। কিন্তু একী! আহারের কথা দূরে থাক, রান্নারই কোন যোগাড় নেই তখন পর্যন্তও! বেলা দুপুর হ'তে চলল, তবু রান্নার কোন ব্যবস্থা হয়নি কেন? উত্তরে, একটুও দ্বিধা না করে সহজভাবেই জানালেন ব্রাহ্মণ প্রভুকে—

বন্যশাক ফলমূল আনিবে লক্ষণ।
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন॥

সহজ-সরল ব্রাহ্মণের মনের ভাবটি বুঝে নিয়ে - তাঁর ভজনপদ্ধতি দেখে খুশি হলেন প্রভু। এরপর বেলা প্রায় তিন প্রহরের সময় তাঁর ভিক্ষাগ্রহণ শেষ হ'তে বুঝা গেল কতদিন ধ'রে রয়েছেন ব্রাহ্মণ অনাহারেই। কিন্তু কেন এই উপবাস?

বিপ্র কহে 'মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন।
অগ্নিজলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন॥
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতাঠাকুরাণী।
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কানে শুনি'।

এই কথা! মুহূর্তমাত্রও ইতস্ততঃ না ক'রেই (স্মিতমুখে)—

প্রভু কহে 'এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা কেন মনে না কর বিচার?
ঈশ্বরপ্রেয়সী সীতা চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিবারে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক, না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি মায়া হরিল রাবণ॥'

* *

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥
বিশ্বাস করহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে'॥

বলতেন শ্রীমা সারদেশ্বরী দেবী—'যখন যেমন, যেখানে যেমন'। মহাপ্রভুর আজকের এই কথাগুলি ও আচরণকে তারই একটি দৃষ্টান্ত ব'লেই ধ'রে নিতে হয়। তবে এটাও কিন্তু ঠিক যে, এগুলি আদৌ কোন একটা স্তোকবাক্য বা কথার

কথাই নয়! বরং ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় দিক থেকেই একে পরম সত্যই বলতে হয়। এবং এই দৃষ্টিতে দেখলে, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক দ্বন্দ্বেরই একটা সহজ-সরল সমাধান হ'য়ে যেতে পারে। এই যে এখানে মহাপ্রভুর উক্তিটি—'প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি' এসম্বন্ধে স্মরণীয় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি দুটিও—'হাড়িপাড়ায় থেকে বামুনপাড়ার খবর পাওয়া যায় না' ও 'একসেরা ঘটিতে চারসের দুধ ধরে না।' অর্থাৎ কিনা, বামুন পাড়ার খবর পেতে গেলে; হাড়িপাড়া ছেড়ে, যেতে হবে বামুনপাড়াতেই; চারসের দুধ ধরাতে গেলে, আধারটিকে সেই অনুপাতেই বড় ক'রে তুলতে হবে! 'নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তারও উর্ধ্বে উঠে, অপ্রাকৃত দৃষ্টি-সহায়েই করতে হবে অপ্রাকৃত বস্তুদর্শন! ঠিক এই কথটিই বলতে শুনা যায় মহাপ্রভুকে আগেও একবার সনাতন প্রসঙ্গে—

* * *

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করেন তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

সেই অতীন্দ্রিয় ভূমিতে পৌঁছে তবেই সেই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করারই কথা!

সে যাই হোক, এরপর রামেশ্বর দর্শনে গিয়ে পণ্ডিতসভায় কূর্মপুরাণ শুনতে শুনতে হঠাৎ পেয়ে গেলেন মহাপ্রভু তাঁর কথার লিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণও। তারপর—

শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন।
রামদাস বিপ্রের কথা হৈলা স্মরণ॥
এসব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হৈল।
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র লৈল॥
নূতন পত্র লিখিয়া পুস্তকে রাখাইল।
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি লৈল॥
পত্র লঞা পুনঃ দক্ষিণ মথুরা আইলা।
রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা॥

পুঁথির পাতাখানি ও সেই সাথে আবারও এইভাবে মহাপ্রভুর দর্শন পেয়ে, ব্রাহ্মণের আজ আর আনন্দ দেখে কে?

বিপ্র কহে 'তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন॥
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার।
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার॥
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সেদিনে।
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে॥'

এইভাবে ব্রাহ্মণের অনুরোধে একরাত্রি তাঁর কুটিরে কাটিয়ে, পরদিন আবার 'যাত্রা হ'ল শুরু' ও তারপর ফেরার পথে আরও অনেক তীর্থদর্শন ও অনেককে ভক্তিধর্মে দীক্ষিত করতে-করতে এসে পৌছিলেন প্রভু মল্লারদেশে। এখানে পৌছিবার পরেই, সঙ্গী ব্রাহ্মণকুমার কৃষ্ণদাসকে ভুলিয়ে নিয়ে যায় ভট্টমারিরা মেয়েমানুষের লোভ দেখিয়ে। কিন্তু সাধ্য কী ভট্টমারিদের তাকে আটকে রাখে! পরদিন ভোর হতে না হতেই তাদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়ে, দেখা যায় মহাপ্রভুকে —'কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিলা গমন'। এরপর এ যাত্রায়ও আবার একবার দেখা হ'য়েছিল তাঁর বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের সাথে, ও এইভাবে ক্রমে-ক্রমে যাত্রাশেষে প্রায় দীর্ঘ দু'বছর পরে এসে মিলিত হয়েছিলেন তিনি নীলাচলে উৎকন্ঠিত ভক্তদের সঙ্গে। এই মিলনের পরেই পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম ও আর আর নীলাচলের ভক্তদের কাছে তাঁর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকাহিনী বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছিলেন মহাপ্রভু, এবারে তারই উল্লেখ ক'রে এখানেই কথা শেষ করছি—

প্রভু কহে 'এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন।
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন'॥

সত্যিই তো!

'মনের মানুষ হয় যে জনা,
ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,
সে দুই-একজনা!
ভাবে ভাসে, রসে ডোবে,
(ওসে) উজান পথে
করে আনাগোনা॥ '—বাউল সংগীত।'

'দুই-একজনাই' বটে! আর তাই কি নিজে চৈতন্যচরিতকারকেও বলতে শোনা যায়—'জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিনজন। স্বরূপ গোসাঞি আর রায় রামানন্দ। শিখি মাহিতী আর ভগিনী অর্দ্ধজন॥" (চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ)।